RARE BOOK

NATIONAL LIBRARY No. 3925 DATE 27/8/09 CALCUTTA

BENGAL LIBRARY 23 NOV 19 WRITERS BUILDINGS

ভারত-মহিলা

The woman's cause is man's ; they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free ;
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall men grow ?

Tennyson.

১ম ভাগ। } ভাদ্র, ১৩১২। { ১ম সংখ্যা

অবতরণিকা।

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্ ॥

সকল ঈশ্বরের যিনি পরম মহেশ্বর, সকল দেবতার যিনি পরম দেবতা, সকল পতির যিনি পতি, সেই স্তবনীয় ভুবনেশ্বরকে আমরা স্মরণ করি।

মঙ্গল-বিধাতা পরমেশ্বরের শ্রীচরণে প্রণিপাত করিয়া আমরা অদ্য "ভারত-মহিলা"কে বঙ্গীয় পাঠক পাঠিকা-গণের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি। বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্যের বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে আজ ইহাকে অভিনন্দন করিতে অনেকেই সঙ্কুচিত হইবেন, আমরা তাহা জানি। বহু আড়ম্বর ও প্রচুর সমারোহ করিয়া, নানা আভরণে সুসজ্জিত হইয়া, প্রবল বাদ্যে আপনার অভ্যুদয় ঘোষণা করিয়া এক এক খানি পত্রিকা বঙ্গ-সাহিত্য-ক্ষেত্রে আবির্ভূত হইতেছে, আর কিছুদিন অতী না হইতেই সাগরে জলবুদ্বুদের ন্যায় কালগর্ভে বিলীন হই যাইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের জাতীয় জীবনে অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ও অস্থিমজ্জায় যে নিরুৎসাহ ও নিরাশ প্রবেশ করিয়াছে, সাহিত্য-ক্ষেত্রেও তাহার অবসাদক প্রবল প্রভাব অবশ্যম্ভাবিরূপে বিস্তৃত হইয়াছে। এব এক খানি পত্রের আবির্ভাব ও তিরোধান সেই অবসা আরও ঘনীভূত করিয়া তুলিতেছে। নীরবে, একটী দুর্ব্বল বঙ্গনারীকে আশ্রয় করিয়া যে ক্ষুদ্র পত্রিকা আজ জন্মগ্রহ করিল, তাহার সুস্থ, সবল দীর্ঘজীবন সম্বন্ধে কেহ যদি প্রথমেই নিরাশ হন, তবে সে বিষয়ে আমাদের কিছুই বলিবার নাই। আমাদের ধারণা এই, যাহার অস্তিত্বের প্রয়োজন আছে, ভগবান্ সংসারে তাহার স্থান করিয়া দেন। এ দেশের নারী জাতির কল্যাণকল্পে সুপরিচালিত একখানি মাসিক পত্রের প্রয়োজনীয়তা সকলেই স্বীকার করেন। রাজনীতিই হউক, আর শিল্প বিজ্ঞানই হউক পুরুষের পার্শ্বে নারী দণ্ডায়মান না হইলে, পুরুষ-শক্তি কখনও সম্যক্ বিকশিত হইতে পারে না

। অভিপ্রায়ে পুরুষের সহিত নারীকে অচ্ছেদ্য বন্ধনে ক করিয়া দিয়াছেন। পুরুষ সে বন্ধন অতিক্রম করিবার করিতে পারেন, কিন্তু বিধাতার বিধান ব্যর্থ করা র সাধ্যায়ত্ত নহে। তাই ছিন্ন-পক্ষ বিহঙ্গিনীর সঙ্গে ত্রে গ্রথিত বিহঙ্গের ন্যায়, এদেশের পুরুষেরাও থ অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ-প্রযত্ন হইতেছেন। কে উন্নত করিয়া, নারীকে সঙ্গে লইয়া তাঁহাদিগকে সর হইতে হইবে। এই সুমহৎ দুষ্কর কর্ম্মে কথঞ্চিৎ ায্য করিবার জন্য "ভারত-মহিলার" জন্ম। এই উদ্দেশ্য নের জন্য "ভারত-মহিলা" এ দেশ ও বিদেশের াশীল পুরুষ ও রমণীগণের নারীজাতির উন্নতিবিধায়ক ার ফল বঙ্গীয় পাঠক পাঠিকাগণের নিকট উপস্থিত রিবে। এতদ্ব্যতীত জ্ঞানের উন্নতি সাধক অন্যান্য য়ও ইহাতে আলোচিত হইবে। গুরু কর্ত্তব্যভার স্তকে ধারণ করিয়া আমরা আজ দুর্ব্বলের বল, অসহায়ের হায়, করুণাময় ভগবানের কৃপা ভিক্ষা করিতেছি; ঃ স্বর্গগত ও জীবিত সাহিত্য-গুরুগণের আশীর্ব্বাদ ার্থনা করিতেছি।

বরণ।

নিত্য বরণীয় কান্ত, অম্বর-প্রসর
তোমার ললাট আজি অধিক সুন্দর
তারা পুঞ্জ কিরণ তিলকে; হে শোভন,
সুগন্ধ উত্তরী তব বসন্ত পবন
কাঁপিছে পুলক ভরে,-দাঁড়ায়েছ আজ
ব্রহ্মাণ্ড উজ্জ্বল করি, হে হৃদয়-রাজ!
আমার বরণ-মালা এ প্রেম আমার
সমর্পি' দিলাম, নাথ, চরণে তোমার!
অনন্ত নক্ষত্রালোকে দিগ্বধূগণ
করেছে মঙ্গলাচার পূর্ব্বে সমাপন।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

ভারত-মহিলা।

নমো নমো নমো দেবী ভারত-মহিলা—
করুণার ধারা অয়ি শান্তি সুবিমলা!—
বহিতেছ যুগে যুগে নীরবে বিরলে,
মানবের অন্তঃপুরে, অন্তরে অন্তরে,
স্বার্থেরে গলায়ে দীপ্ত প্রেমের অনলে!
নহ দেবী নহ তুমি বিচিত্র বর্ণক
মন ভুলাবার ওগো মায়া-ক্রীড়নক!
সংসার-অঙ্গনে তুমি মহা বীরাঙ্গনা!
নাহি শর, নাহি তূণ, অসির ঝঞ্ঝনা,—
প্রেমে তুমি সর্ব্বজয়ী—সুকোমল করে
সর্ব্বদুঃখ সর্ব্বতাপ লও তুমি হরে'!
মূঢ় নর নাহি চিনি দেবীগো তোমারে,
উপাধান তলে রাখি' রতনের হারে
খুঁজে মরি' দিশাহারা—দ্বারে দ্বারে দ্বারে!

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জাপানের স্ত্রী-বিশ্ববিদ্যালয়।

সমগ্র পৃথিবীর নিকট ক্ষুদ্র জাপান বর্ত্তমান সময়ে এক মহাশক্তিরূপে পরিচিত হইয়াছে। দশ এগার বৎসর পূর্ব্বে বিরাট চীন সাম্রাজ্য জাপানের প্রভাব অনুভব করিয়া কম্পিত-কলেবর হইয়াছিল। সম্প্রতি বিপুল-বিক্রম ব্রিটিশাদি সমস্ত সভ্য জাতির ভীতি-স্থল অতিকায় রুষ এই ক্ষুদ্র জাতির পদলাঞ্ছিত, উহার প্রচণ্ড নৌবল ও বিশাল সেনাবাহিনী ইহার হস্তে বিধ্বস্ত। ইংলণ্ড, আমেরিকা, জার্ম্মানি প্রভৃতি উন্নত দেশ এখন জাপানের সখ্য লাভের জন্য লালায়িত। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশবাসী চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এই অপূর্ব্ব শক্তির পরিচয় পাইয়া ইহার প্রকৃত কারণানুসন্ধানে নিযুক্ত হইয়াছেন। এ জগতে বিনা কারণে কোন ঘটনা ঘটে না। জাপানের

এই অভ্যুত্থানও অতিপ্রাকৃত ঘটনা নহে। সাধারণ সকল ব্যাপারের ন্যায় ইহাও কার্য্যকারণ-শৃঙ্খল দ্বারা সুনিয়মিত। অতি প্রাচীনকাল হইতে জাপানের জাতীয় জীবনে এই শক্তির উপাদান সমূহ সঞ্চিত হইয়া আসিতেছিল। বর্ত্তমান অভ্যুদয় সেই সঞ্চয়ের অভিব্যক্তি মাত্র। অদ্য সেই সকল উপাদান সম্বন্ধে আলোচনা করিব না। যে শিক্ষা প্রণালী এই অভিব্যক্তির প্রধান কারণ তাহার একটী অতি প্রয়োজনীয় বিভাগ স্ত্রী-বিশ্ববিদ্যালয়ের কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রদান করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

বর্ত্তমান সম্রাটের অনুশাসনে ভদ্র ইতর ও স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে জাপান সাম্রাজ্যের সকল শিশুকেই অন্ততঃ চারি বৎসর কাল বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে হয়। রাজকোষ হইতে এই শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহিত হয়। বর্ত্তমান সময়ে জাপানে শতকরা ১০ জনের অধিক অশিক্ষিত লোক নাই, কিন্তু সম্রাটের উপরোক্ত অনুশাসনের ফলে আর কয়েক বৎসর পরে জাপানে একটীও নিরক্ষর লোক থাকিবে না। জাপান সাম্রাজ্যের স্তরে স্তরে শিক্ষার দৈববল প্রবেশ করিয়া জাপানের জাতীয় জীবনের অন্তর্নিহিত শক্তি সকলকে বিকশিত করিতেছে, এবং ক্ষুদ্র জাপানকে অদ্য জগতের বরেণ্য করিয়া তুলিয়াছে।

দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতবাসীকে এখনও একথাটা বুঝাইবার প্রয়োজন হয়, যে নারীজাতি সমাজের ও দেশের অর্দ্ধাংশ; তাঁহারা সুশিক্ষিত ও সমুন্নত না হইলে দেশের কল্যাণ নাই। আমাদের দেশে আমরা স্ত্রীজাতিকে এতই হীন করিয়া রাখিয়াছি, যে এই নিতান্ত সহজ সত্যটীও যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন হয়। কিছুকাল পূর্ব্বে জাপানেও স্ত্রীজাতির অবস্থা এদেশেরই মত হীন ছিল। কিন্তু জাপানীগণ যখন বুঝিতে পারিলেন, নারীকে তাঁহার ন্যায্য সম্মান ও প্রাপ্য অধিকার না দিলে শুধু যে দেশের বর্ত্তমান অর্দ্ধেক শক্তি নষ্ট হইয়া যায় তাহা নহে, কিন্তু ভবিষ্যৎও অন্ধকারময় হইয়া পড়ে, তখনই তাঁহারা নারীজাতির উন্নতি সাধনে বদ্ধপরিকর হইলেন। তাঁহাদের এই চেষ্টার ফলে বর্ত্তমান সময়ে জাপানের শতকরা ৯০ জনেরও অধিক স্ত্রীলোক অল্পাধিক পরিমাণে শিক্ষিতা।

উচ্চতার ক্রম অনুসারে জাপানের বিদ্যালয় সমূহ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। নিম্ন প্রাথমিক (Lower Primary), উচ্চ প্রাথমিক (Upper Primary), উচ্চ শ্রেণী (High School) ও বিশ্ববিদ্যালয়। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে সাধারণতঃ চারি বৎসর পাঠ করিতে হয়। নিম্নপ্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয়ে বালকবালিকাগণ এক সঙ্গেই অধ্যয়ন করে। তবে কোন শ্রেণীতে ছাত্রাধিক্য হইলে বালক ও বালিকাগণকে স্বতন্ত্র শাখায় বিভক্ত করা হয়। বালিকাগণকে সাধারণ পাঠের অতিরিক্ত শেলাই শিক্ষা করিতে হয়। উচ্চশ্রেণীর (High School) বিদ্যালয় হইতে বালক ও বালিকাদিগের শিক্ষা স্বতন্ত্র আকার ধারণ করে। কতকগুলি বিষয় উভয়েরই শিক্ষণীয়, কিন্তু নরনারীর কার্য্যক্ষেত্রের বিভিন্নতা অনুসারে তখন হইতে তাহাদের শিক্ষণীয় বিষয়ও পৃথক করিয়া দেওয়া হয়। উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়ে অধীত বিষয় আমাদের দেশের এফ, এ, পাঠ্যের তুল্য। পূর্ব্বে, জাপানে, বালিকাদিগের উচ্চতর শিক্ষা লাভ করিবার কোন সুবন্দোবস্ত ছিলনা, কিন্তু উন্নতির রুদ্ধস্রোত একবার যখন উন্মুক্ত হইল, তখন অর্দ্ধ পথেই প্রতিহত হইবে কেন? জাপ-নারীর উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও জ্ঞানপিপাসা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গত ১৯০০ খৃষ্টাব্দে জাপানে স্ত্রী-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমি সেই সময়ে জাপানে অবস্থিতি করিতেছিলাম, এবং স্ত্রী-বিশ্ববিদ্যালয়-স্থাপন-অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলাম। ইহা রাজকীয় বিদ্যালয় নহে। জনসাধারণের অর্থে, তাহাদেরই উদ্যোগে এই সুমহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রধানতম উদ্যোক্তা অধ্যাপক নারুসে ও শ্রীমতী হিরাওকা। "ভারত-মহিলাতে" এই মহীয়সী নারীর বৃত্তান্ত ভবিষ্যতে প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা, এজন্য বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপন বিষয়ে তাঁহার চেষ্টা ও শ্রমের বিবরণ এ স্থলে উল্লেখ

করিব না। এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা মূলধন সংগ্রহ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়, তন্মধ্যে শ্রীমতী হিরাওকা একাকী ৫০ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। হিরাওকার পিতৃকুল মিৎসুই পরিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের বাটীর জন্য প্রয়োজনীয় ভূমি দান করিয়াছিলেন। এই মিৎসুইগণ জাপানের অতি সম্ভ্রান্ত ও সম্পন্ন পরিবার। পৃথিবীর নানা স্থানে ইঁহাদের ব্যবসায়ের শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বোম্বাই নগরে ইঁহাদের এক শাখা আছে, শীঘ্রই কলিকাতাতেও এক শাখা প্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা।

সংস্থাপনের অব্যবহিত পরেই বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচ শত ছাত্রী প্রবেশ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে প্রায় বারশত ছাত্রী অধ্যয়ন করিতেছেন। তন্মধ্যে সাতশত ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয় সংসৃষ্ট ছাত্রী নিবাসে বাস করেন। রাজকীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের নির্দ্ধারিত পাঠ্য অধ্যয়নের নিমিত্ত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃত্বাধীনে একটী উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয় আছে, একটী কিণ্ডার গার্টেন ও একটী সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয় শীঘ্রই প্রতিষ্ঠিত হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সকল ছাত্রী ভবিষ্যতে শিক্ষয়িত্রীর কর্ম্মে নিযুক্ত হইবেন, এই সকল বিদ্যালয়ের সংশ্রবে তাঁহারা অধ্যাপনা কার্য্যে প্রত্যক্ষ কার্য্যগত শিক্ষা লাভ করিবেন। জাপানে শিক্ষয়িত্রীগণের আদর দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। জাপানীগণ শিক্ষার প্রথম চারি বৎসর শিশুদিগকে শিক্ষয়িত্রীর শিক্ষাধীনে রাখা যুক্তিযুক্ত মনে করেন। এই পদ্ধতিটী অতি সমীচীন বলিয়াই বোধ হয়। শিক্ষা প্রণালীর দোষে সুকুমারমতি শিশুদিগের অন্তরে একবার শিক্ষাভীতি প্রবেশ করিলে ইহার কুফল তাহাদিগকে চিরকাল ভোগ করিতে হয়। কোমল-হৃদয় মাতৃজাতিই সুশিক্ষা লাভ করিলে শিশুর মনোবৃত্তি বিকাশের প্রণালী, শিশু-হৃদয়ের অব্যক্ত, অস্ফুট আকাঙ্ক্ষা ও স্বাভাবিক গতি প্রকৃষ্টরূপে বোধগম্য করিতে পারেন; পুরুষের পক্ষে তাহা অপেক্ষাকৃত দুরূহ। ভগবান্ তাঁহার জ্ঞানময় বিধানে শিশুর ভার নারীর হস্তেই অর্পণ করিয়াছেন। সুশিক্ষা প্রাকৃতিক বিধানেরই অনুসরণ করে। জাপানীরা রমণীর হস্তে জাপ-সন্তানের প্রাথমিক শিক্ষার ভার ন্যস্ত করিয়া সুবিবেচনারই পরিচয় প্রদান করেন।

স্ত্রী-বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পরীক্ষোত্তীর্ণা মহিলাদিগকে কোন উপাধি প্রদত্ত হয় না। তাঁহারা রাজকীয় সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ লাভেরও অধিকারিণী নহেন। উপাধি লাভ না করিলেও স্ত্রী-বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণা ছাত্রীগণ সমাজে প্রভূত সম্মান প্রাপ্ত হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়ন সমাপন করিয়া অধিকাংশ মহিলা স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, কেহ কেহ শিক্ষয়িত্রীর পদ গ্রহণ করেন, কিন্তু অল্প সংখ্যক নারীই অবিবাহিতা থাকেন। স্ত্রী-বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা দ্বারা অবিবাহিতা, বয়স্কা মহিলার সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করেন না।

গৃহশিক্ষাই মানব চরিত্রের ভিত্তিভূমি। ধীরে, শিশুর অজ্ঞাতসারে, অনেক স্থলে পরিজনবর্গেরও অলক্ষিতে শিশুচরিত্রে গৃহশিক্ষার প্রভাব বিস্তৃত হয়। এই শিক্ষার প্রকৃতি অতি কোমল ও সুমিষ্ট সন্দেহ নাই, কিন্তু ভাবী জীবনে ইহার শক্তি দুর্জ্জয় ও অপ্রতিহত। কোন মানবই ন্যূনাধিক পরিমাণে এই শিক্ষার প্রভাবাধীন না হইয়া পারে না। জাপানের মাতৃজাতি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতম শিক্ষা লাভ করিয়া আদর্শ গৃহশিক্ষা প্রদানের উপযুক্ত হন। নেপোলিয়ন বলিয়াছেন, শিশুর ভাবী শুভাশুভ জননীর উপর নির্ভর করে। মানসিক শক্তিতে স্বামীর তুল্যশক্তিশালিনী আদর্শ পত্নী এবং সন্তান পালনে সুশিক্ষিতা, পারদর্শিনী, আদর্শ জননী গঠন করাই জাপানী স্ত্রী-বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশ না হইলে এই সুকঠিন কর্ত্তব্যদ্বয় সাধনের উপযুক্ততা লাভ করা সম্ভব নহে। সুতরাং নারীজীবনে প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধন বিষয়ে মনোনিবেশ করা জাপানের স্ত্রী-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণের প্রথম কার্য্য বলিয়া পরিগণিত।

জাপানের চিন্তাশীল নেতৃবর্গ উপলব্ধি করিয়াছেন,

যে জাতীয় জীবনে ও চরিত্রে যে সকল অভাব ও ত্রুটী আছে, অকস্মাৎ তুমুল বিপ্লব সংঘটন করিয়া তাহা দূর করা অসম্ভব এবং অসঙ্গত। এই নিমিত্ত প্রথমে মাতৃজাতিকে সুগঠিত করিয়া পরবর্ত্তী বংশধরগণের জীবনের ভিত্তি-ভূমিকে উন্নত ও সুদৃঢ় করিবার চেষ্টা করা হয়। অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বিষয়েও "ক্রমিক উন্নতি" জাপানীদিগের মূল সূত্র।

জাপান কর্ম্মবাদের দেশ। কর্ম্মবিহীন মতপ্রধান জীবনকে জাপানীরা অত্যন্ত অশ্রদ্ধা করেন। জ্ঞানে গভীরতা জাপানীদিগের পরম আদরের বস্তু, কিন্তু যে জ্ঞান অন্তরে বাস করিয়া মানবকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে না, জাপানীরা তাহাকে প্রকৃত জ্ঞান বলিয়া স্বীকার করেন না। এই জন্য জাপান-প্রবাসী ভারতীয় ছাত্র-গণের নিকট পতিত ভারতের গভীর আধ্যাত্মিকতার গৌরব শ্রবণ করিয়া জাপানের জ্ঞানিগণ বিদ্রূপ করেন। জাপানের একটী বালিকাবিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীযুক্ত কোবায়াসি সম্প্রতি এদেশে আসিয়াছেন। এদেশের প্রধান প্রধান বালিকাবিদ্যালয়গুলি পরিদর্শন করিয়া তিনি আমাকে বলিয়াছেন, "আপনাদের বালিকাবিদ্যালয় গুলিতে কার্য্যগত শিক্ষা নাই, গ্রন্থগত শিক্ষার প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ দেখিয়া মনে হয়, নারীগণের মধ্যে অযথা পরিমাণে ভাবুকতা বৃদ্ধির আশঙ্কা আছে।" জাপানের স্ত্রী-বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্ম্মশীলতাকে আশ্রয় করিয়া বুদ্ধিবৃত্তিকে বিকাশ করিবার চেষ্টা করা হয়। যন্ত্র-বিহীন বিজ্ঞানশালায় উচ্চবিজ্ঞান অধ্যয়ন করিয়া আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্রীগণের মনোবৃত্তি সকল আশানুরূপ বিকাশ প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু শিক্ষাপ্রণালীর গুণে জাপানী মহিলাগণ বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিয়া মনোবৃত্তি বিকাশে সাহায্য লাভ করেন। সুচারুরূপে গৃহকার্য্য সম্পাদনে দক্ষতা লাভের জন্য যে সময় ও শক্তি ব্যয়িত হয় তদ্দ্বারা নারীর উন্নতি সাধনের কোন প্রকার ব্যাঘাত বা তাঁহার মানসিক শক্তির কিঞ্চিন্মাত্রও অপচয় হয়, জাপানীগণ তাহা স্বীকার করেন না। জাপানের উচ্চশিক্ষিতা রমণীগণ কার্য্যক্ষেত্রে সপ্রমাণ করিয়াছেন, যে বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে উচ্চশিক্ষা লাভ করিলে নারীর বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত, অনুসন্ধানস্পৃহা বলবতী, কর্ত্তব্যজ্ঞান প্রবল, আন্তরিক বৃত্তিনিচয় বিকশিত এবং হৃদয় বলিষ্ঠ হয়। এই প্রকার নারীকে গৃহে স্থাপন কর, তিনি আদর্শ পরিবার গঠন করিবেন, রোগীর সেবায় আহ্বান কর, আদর্শ সুশ্রূষাকারিণী হইবেন, মন্ত্রণা সভায় উৎকৃষ্ট মন্ত্রণা দান করিবেন, জাতীয় বিপদে স্বামী, সন্তান ও ভ্রাতৃগণকে আত্মোৎসর্গের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করিবেন এবং সর্ব্বত্র আপনার কর্ত্তব্য অন্বেষণ করিয়া নিজের স্থান নিজে অধিকার করিয়া লইবেন।

স্ত্রী-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীনিবাসে গৃহকার্য্যে নিপুণতা শিক্ষাদানের উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ছাত্রীগণ যাহাতে আত্মনির্ভর ও আত্মোন্নতি সাধনে যত্নবতী হন, একতা ও মিলনের ভাব অনুশীলন করেন এবং ছাত্রীনিবাসকে গার্হস্থ্য সুখ সম্ভোগের স্থান করিয়া তুলিতে পারেন, তজ্জন্য সবিশেষ চেষ্টা করা হইয়া থাকে। তাঁহাদিগের হৃদয়ে নানা প্রকার উচ্চাকাঙ্ক্ষা জন্মাইয়া সেই আকাঙ্ক্ষাগুলিকে উত্তরোত্তর প্রবলতর করিবার জন্য সমুচিত যত্ন করা হয়। যে সকল ছাত্রী পাশ্চাত্য গৃহধর্ম্ম বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে বিদেশীয় প্রণালীতে সজ্জিত গৃহে, বিদেশীয় অধ্যাপকের শিক্ষাধীন রাখা হয়। উচ্চতর শ্রেণীর ছাত্রীগণকে একাদিক্রমে ছাত্রীনিবাসের ভার অর্পণ করিয়া গৃহকর্ম্মে দক্ষতা লাভের সুযোগ দেওয়া হয়। আপন আপন শক্তি অনুসারে সকল ছাত্রীকেই ছাত্রীনিবাসের গার্হস্থ্য কার্য্য সম্পাদন বিষয়ে সাহায্য করিতে হয়। ছাত্রীনিবাসে প্রত্যেক ছাত্রীর মাসিক ব্যয় ১২। ১৩ টাকার অতিরিক্ত নহে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বেতন ৭০। ৮০ টাকা মাত্র।

স্ত্রী-বিশ্ববিদ্যালয়ে আপাততঃ তিনটী মাত্র বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গার্হস্থ্যবিজ্ঞান বিভাগ, জাপানী সাহিত্য বিভাগ ও ইংরেজী সাহিত্য বিভাগ। তন্মধ্যে গার্হস্থ্যবিজ্ঞান বিভাগেই অধিক সংখ্যক ছাত্রী অধ্যয়ন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীদিগকে ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া

হয় না, সকলেই ধর্ম্ম বিষয়ে নিজ নিজ স্বাধীন মত রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন। প্রত্যেক বিভাগেই মতগত ও কার্য্যগত নীতি-বিজ্ঞান এবং সাম্রাজ্যের প্রজার ও জাতীয় জীবনের কর্ত্তব্যবিধি শিক্ষা দেওয়া হয়। জাপান ও সমগ্র জগতের উন্নতির সহিত সমতা রক্ষা করিয়া গৃহিণী, পত্নী, জননী, সম্রাটের প্রজা এবং দেশের দুহিতারূপে প্রত্যেক জাপ-রমণী যাহাতে দৈনিক জীবনের কর্ত্তব্য সকল প্রতিদিন সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে পারেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীগণকে এই শিক্ষা প্রদান করিতে কর্ত্তৃপক্ষ বিধিমত চেষ্টা করেন।

স্ত্রী-বিশ্ববিদ্যালয়ে শারীরিক ব্যায়ামের প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদান করা হয়; কারণ জাপানীগণ এই তত্ত্বটী উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, যে ভবিষ্যৎ বংশের জননীগণ দুর্ব্বলকায়া হইলে জাতীয় জীবনের ভবিষ্যৎ নিরাপদ হইতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক শ্রেণীতে স্বাস্থ্যবিধি ও শরীরতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রায় প্রত্যেক শ্রেণীতেই ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু সকল শ্রেণীতে ইংরেজী অবশ্য-পাঠ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট নাই। শিক্ষার্থিনীগণের পারদর্শিতা পরীক্ষা করিবার জন্য ইংলণ্ড বা এ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ন্যায় কোন পরীক্ষা গৃহীত হয় না। অধ্যাপক বর্গের মন্তব্য ও পরীক্ষার্থিনীর মৌলিক রচনা দ্বারা পরীক্ষার্থিনীর কৃতিত্বের বিচার হয়।

সম্মিলনের দ্বারা যে সমবেত-শক্তি ও কর্ম্মোৎসাহের সঞ্চার হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ তাহার প্রভাব সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছেন। ব্যক্তিগত স্বার্থ অপেক্ষা ছাত্রীমণ্ডলীর স্বার্থ ও গৌরবের প্রতি তাঁহারা অধিক মনোযোগিনী। সম্পূর্ণরূপে পুরুষের সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া তাঁহারা একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা পরিচালিত করিতেছেন। এই পত্রিকার প্রবন্ধাবলী ও সম্পাদন প্রণালী দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, জাপানের স্ত্রী-বিশ্ববিদ্যালয় কি সুন্দর ফল উৎপাদন করিতেছে।

অধ্যাপক নারুসে বলেন, "নারী চরিত্রের সাধারণ দুর্ব্বলতা এই, যে তাঁহারা অন্ধভাবে অধ্যাপকগণের উপদেশ অথবা গ্রন্থকারগণের মতামত গ্রহণ করেন। আমাদের স্ত্রী-বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আমরা এই দুর্ব্বলতা দূর করিতে ইচ্ছা করি। আমাদের ছাত্রীগণ নানা বিষয় অধ্যয়ন করিয়া স্বীয় চেষ্টায় অধীত বিষয় আয়ত্ত করিবেন, নিজেরা চিন্তা করিবেন, নিজেরা আলোচ্য বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন। বস্তুসমূহ ও ঘটনাবলীর অন্তর্নিহিত বিশেষত্ব ও তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ আবিষ্কার করিয়া বিজ্ঞান ও শিল্পের নিগূঢ় তত্ত্ব সকল অবগত হইবেন। এইরূপে নিজস্ব জ্ঞান, নিজস্ব চিন্তা ও নিজস্ব শক্তি-সমন্বিত হইয়া আমাদের নারীগণ সংসারে প্রবেশ করিবেন।" জাপানের নেতৃবর্গ নারীগণকে কি প্রকার মহিমাময়ী করিয়া তুলিবার আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা করিতেছেন, অধ্যাপক নারুসের উক্তি আলোচনা করিলে আমরা তাহার আভাস প্রাপ্ত হই।

জাপানে স্ত্রীলোকগণ নানা প্রকার শিল্পাগার ও কৃষিক্ষেত্রে কার্য্য করেন। জাপানীগণ এখন শিল্প, বিজ্ঞান ও কৃষি বিষয়ে নারীদিগকে সুশিক্ষা প্রদানের জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত অধ্যাপক নারুসে ইউরোপ ও আমেরিকার নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া এ সকল বিষয়ে প্রয়োজনীয় বিবরণ সংগ্রহ করিতেছেন। সকল আয়োজন পূর্ণ হইলে স্ত্রী-বিশ্ববিদ্যালয়ে এ সকল বিষয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইবে।

ভারতবর্ষের ন্যায় জাপানেও স্ত্রীজাতির অবস্থা এক সময়ে অত্যন্ত উন্নত ছিল। কিরূপে, কি কারণে, প্রাচ্য দেশ সমূহে নারীগণ তাঁহাদের উন্নত পদবী হইতে বিচ্যুত হইলেন, তাহার প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয় করা সহজ নহে। জাপানীগণ মনে করেন, বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব জাপানে নারী-জীবনে দুর্গতি আনয়ন করিয়াছে। জাপানীগণ আশা করিতেছেন, সুশিক্ষাবলে তাঁহাদের রমণীগণ অচিরে তাঁহাদের পূর্ব্ব গৌরব পুনরুদ্ধার করিবেন এবং পুরুষের সহিত পূর্ণসমকক্ষতা লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় আর কতদিন আমাদের কুললক্ষ্মীগণের উন্নতির প্রতি উদাসীন থাকিবেন ?

শ্রীরমাকান্ত রায়।

বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষা।*

মাহাত্মা ডেভিড্ হেয়ার এ দেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রকৃত জন্মদাতা; সেজন্য বঙ্গবাসী চিরদিন তাঁহার পবিত্র স্মৃতি শ্রদ্ধার সহিত অন্তরে ধারণ করিয়া আসিতেছে। তিনি স্কট্‌ল্যাণ্ডের অধিবাসী ছিলেন; ঘড়ির ব্যবসা করিতে এদেশে আগমন করেন। অবশেষে বিষয় কর্ম্ম হইতে অবসৃত হইয়া যাহাতে এদেশের অধিবাসীদিগের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলিত হয় তদ্বিষয়ে মনযোগী হন ও সেজন্য আপনার শ্রম ও অর্থ অকাতরে ব্যয় করিতে আরম্ভ করেন। প্রধানতঃ তাঁহারই যত্নে ও সুপ্রিম কোর্টের তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি স্যার হাইড্ ইষ্ট ও কলিকাতাবাসী এদেশীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের সাহায্যে, ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে দেশীয় বালকদিগের শিক্ষার জন্য কলিকাতা নগরে সর্ব্ব প্রথম ইংরেজী স্কুল স্থাপিত হয়। কিন্তু অতি অল্পকালের মধ্যেই হেয়ার অনুভব করিলেন, যে অগ্রে দেশীয় ভাষায় কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিয়া না লইলে বালকদিগের পক্ষে ইংরাজী শিক্ষায় সন্তোষজনক ফল প্রদর্শন করা কথনই সম্ভব নহে। তজ্জন্য ঐ বৎসরের শেষ ভাগে তাঁহার যত্নে সহরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ইংরাজী ও বাংলা প্রাথমিক স্কুল স্থাপন উদ্দেশ্যে "স্কুল সোসাইটী" নামে এক সভা গঠিত হয়। হিন্দুসমাজের তৎকালীন নেতা রাজা রাধাকান্ত দেব এবং হেয়ার, উভয়ে উক্ত সমিতির সম্পাদক নিযুক্ত হন। রাধাকান্ত দেব এই সভার উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে প্রচুর সাহায্য করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসরের মধ্যেই স্কুল সোসাইটী সহরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অনেকগুলি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। সে সকল বিদ্যালয় বালকদিগের জন্যই স্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু প্রথম প্রথম অনেকগুলি বিদ্যালয়ে বালিকাদিগকেও ভর্ত্তি করিয়া লওয়া হইয়াছিল, এবং শুনা যায়, বৎসরের শেষে বালকদিগের সঙ্গে বালিকারাও রাজা রাধাকান্ত দেবের ভবনে পারিতোষিক গ্রহণার্থ উপস্থিত হইত।

কিন্তু শীঘ্রই বালক বালিকার একত্র পাঠ করা উচিত কিনা তদ্বিষয়ে স্কুল সোসাইটীর সভ্যদিগের মধ্যে মতান্তর উপস্থিত হওয়ায় ঐ সকল বিদ্যালয়ে বালিকাদিগকে ভর্ত্তি করা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। উহাতে স্কুল সোসাইটীর স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী সভ্যগণ নিতান্ত মনোক্ষুণ্ণ হইলেন। কিন্তু তাঁহারা এ বিষয়ের আন্দোলনে নিবৃত্ত হইলেন না। এই আন্দোলনের ফলে "লসন্ ও পিয়ার্সের সেমিনারী" (Lawson and Pearce's Seminary) নামক বালিকা বিদ্যালয়ের মহিলাগণের উদ্যোগে "ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি" (Female Juvenile Society) নামে এক সভা গঠিত হয়। এই সভা স্থাপিত হওয়ায় রাজা রাধাকান্ত দেব অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং "স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক" নামে এক ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রণয়ন করিয়া এই সভার হস্তে প্রদান করেন। এই নব প্রতিষ্ঠিত সভার সভ্যগণ অতি উৎসাহের সহিত কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের দ্বারা সহরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অনেকগুলি বালিকাবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল।

ইতিমধ্যে আর একটী অনুকূল ঘটনা উপস্থিত হয়। স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনাভিলাষী ব্যক্তিগণ যে আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন তাহার তরঙ্গ সুদূর ইংলণ্ড পর্য্যন্ত গিয়া পৌঁছিল, এবং "ব্রিটিশ এণ্ড ফরেণ স্কুল সোসাইটীর" (British and Foreign School Society) সভ্যগণ এদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের সাহায্য করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা কুমারী কুক্ নাম্নী এক মহিলাকে এই উদ্দেশ্যে এদেশে প্রেরণ করিলেন। কুমারী কুক্ ১৮২১ খৃষ্টাব্দে এদেশে আগমন করিয়া স্কুল সোসাইটীর সহিত এক যোগে কাজ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন কিন্তু স্কুল সোসাইটী পূর্ব্বোক্ত মতবিরোধ হেতু তাঁহাকে সাহায্য করিতে অস্বীকার করিলেন। তখন তিনি বাপ্তিষ্ট মিশন সোসাইটীর সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদের সাহায্যে নানা স্থানে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন

* "হিন্দুস্থান রিবিউ" নামক ইংরেজী মাসিক পত্র হইতে অনুবাদিত। ভাঃ মঃ সঃ।

করেন। কিন্তু পরে মিঃ উইলসন নামে একজন খৃষ্টীয় প্রচারকের সহিত তাঁহার বিবাহ হওয়ায় আর পূর্ব্বের ন্যায় একাগ্রমনে একার্য্যে ব্রতী থাকা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইল না। এইরূপ অবস্থায়, অপর কয়েক জন সহৃদয়া ইংরাজমহিলা, তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল লর্ড আম্‌হার্ষ্টের পত্নী লেডী আম্‌হার্ষ্টকে সভাপতি করিয়া "বেঙ্গল লেডীস্ সোসাইটী" (Bengal Ladie's Society) নামে এক সভা গঠন করেন। এই সভার সভ্যগণ অতি উৎসাহের সহিত কলিকাতা এবং মফঃস্বলের নানা স্থানে অনেকগুলি বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাঁহারা তাঁহাদের কর্য্যক্ষেত্রের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দ্দিক হইতে লোকের প্রশংসা, ধন্যবাদ ও আন্তরিক সহানুভূতি প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। কিন্তু বিদেশীয়গণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত ও পরিচালিত এদেশের উন্নতিকর সকল কার্য্যের সাধারণতঃ যে অবস্থা ঘটে অবশেষে এই সভারও তাহাই হইয়াছিল। কালক্রমে ইহার কোন কোন সভ্যের মৃত্যু হইল। কেহ বা এদেশ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন; সেই জন্য কিছুকাল পরে ইহার কার্য্য বন্ধ হইয়া গেল।

অতঃপর দীর্ঘকাল বঙ্গদেশে স্ত্রী শিক্ষার আন্দোলন একরূপ নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছিল। সে সময়ে শুধু খৃষ্টীয় প্রচারকগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত কয়েকটী বালিকা বিদ্যালয় ব্যতীত আর কোনও বালিকাবিদ্যালয়ের নামও শুনিতে পাওয়া যায় নাই। কিন্তু তাঁহাদের কার্য্যক্ষেত্র কেবল মাত্র স্বদলভুক্ত এদেশীয়দিগের কন্যাদের মধ্যেই আবদ্ধ থাকায় তাঁহারা অপর সম্প্রদায় ভুক্ত লোকের নিকট হইতে বিশেষ কোন সাহায্য প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই। এক সময় যখন লেডী আমহার্ষ্ট প্রমুখ মহিলাগণ দ্বারা সংস্থাপিত পূর্ব্বকথিত "লেডীজ্ সোসাইটী" কলিকাতায় একটী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন, তখন রাজা বৈদ্যনাথ নামে কলিকাতার এক ধনিসন্তান সেজন্য কুড়ি হাজার টাকা সাহায্য করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন এই খৃষ্টীয় প্রচারকদিগের কার্য্যে কেহই সাহায্য করিতে চাহিল না।

এই ভাবে বহুদিন কাটিয়া গেল। অবশেষে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে গভর্ণর জেনারেলের সভার সদস্য নিযুক্ত হইয়া এক শক্তিশালী পুরুষ এদেশে আগমন করেন, তাঁহার নাম ড্রিঙ্ক্‌ওয়াটার বেথুন। তিনি স্কট্‌ল্যাণ্ড দেশের অন্তর্গত হ্যাল্‌ফোর্ড নিবাসী কর্ণেল জন্ ড্রিঙ্ক্‌ওয়াটার বেথুনের পুত্র। জন বেথুন কয়েকখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ লিখিয়া ইংলণ্ডে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু মহাত্মা বেথুন তাঁহার পিতা অপেক্ষা মাতার নিকট হইতেই তাঁহার শিক্ষা ও প্রতিভা বিকাশ বিষয়ে অধিক সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা জননীর নিকটেই আরম্ভ হয়। জননী দেবীর নিকট হইতে যে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহার ফলেই উত্তর কালে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বিশেষ সুখ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সাঙ্গ করিয়া তিনি আইন অধ্যয়ন করেন ও পরে পার্লামেন্টের কাউন্সেলার নিযুক্ত হন। সেই কার্য্যে তাঁহার ক্ষমতা ও পারদর্শিতার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে ভারতের গভর্ণর-জেনারেলের সভার ব্যবস্থা-সচিব অর্থাৎ লিগ্যাল মেম্বরের পদে মনোনীত করা হয়। এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকার সময় তিনি বঙ্গদেশে শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্যে গঠিত শিক্ষা কমিটির (Education Council) সভাপতি নিযুক্ত হন। উহার সভাপতিরূপে মিঃ বেথুন আপনার দেহ মনের সমগ্র শক্তিই এদেশের শিক্ষার উন্নতি সাধনে নিয়োগ করিয়াছিলেন। স্ত্রীশিক্ষা প্রচলন এই সভার এক প্রধান কার্য্য ছিল। খ্যাতনামা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার, তৎকালের এই দুই প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, এই কার্য্যে বেথুনকে বিশেষরূপ সাহায্য করিয়াছিলেন, এবং প্রধানতঃ তাঁহাদেরই সাহায্যে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ৭ই মে তারিখে তিনি কলিকাতা নগরে বালিকাদিগের জন্য এক অসাম্প্রদায়িক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। উহাই পরে মহাত্মা বেথুনের নামানুসারে বেথুন কলেজ নামে পরিচিত হইয়াছে।

কিন্তু ইহাই এ শ্রেণীর প্রথম বিদ্যালয় নয়। ইতিপূর্ব্বে নব্য বঙ্গের এক প্রধান নেতা সুপ্রসিদ্ধ প্যারীচরণ

কিন্তু বঙ্গদেশের লোক সংখ্যার হিসাবে ইহা কি সামান্য! বিগত সেন্সাস্ রিপোর্টে দেখা যায়, বঙ্গদেশে লোক সংখ্যার অনুপাতে প্রতি সহস্রে পাঁচ জন স্ত্রীলোক লিখিতে বা পড়িতে জানে। একথাও আমাদের স্মরণ করা প্রয়োজন যে, ঐ ১,১৬,১৬৯টী বালিকার মধ্যে অধিকাংশই নিম্নশিক্ষা লাভ করিয়া থাকে। সমগ্র বাঙ্গলা দেশে বালিকাদিগের জন্য উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয় এই কয়েকটী মাত্র আছে ;—কলিকাতার বেথুন কলেজ, ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়, ঢাকার ইডেন ফিমেল স্কুল, বাঁকিপুরের বালিকা বিদ্যালয়, ও শ্রীহট্টের বালিকা বিদ্যালয়। এই সকল বিদ্যালয়ে সাধারণতঃ খৃষ্টান অথবা ব্রাহ্ম বালিকারাই পাঠ করিয়া থাকে। সমগ্র দেশে ব্রাহ্ম ও খৃষ্টান বালিকাই বা কয়টী !

নিম্নশ্রেণীস্থ বালিকাবিদ্যালয়গুলির অবস্থা অতি শোচনীয়। সেগুলিতে উন্নতির চিহ্ন কিছুই লক্ষিত হয় না। দশ বৎসর হইতে না হইতেই বালিকাদিগকে বিবাহের জন্য বিদ্যালয় ছাড়াইয়া লওয়া হয়। ঐ সময়ের মধ্যে বালিকারা যে শিক্ষালাভ করে, তাহা নিতান্তই সামান্য। তদ্ভিন্ন ঐ সকল বিদ্যালয়ে সুশিক্ষার উপযোগী কোন যন্ত্রাদি নাই। বালিকাদিগের সুশিক্ষার প্রতি অভিভাবকগণের তেমন দৃষ্টি নাই। বিবাহের সময় তাহারা কিছু লিখিতে বা পড়িতে জানে, এই কথা বলিতে পারিলেই অভিভাবকগণ যথেষ্ট মনে করেন। তদধিক আর কিছু তাঁহারা চাহেন না। সুতরাং এই সকল বিদ্যালয়ে যে শিক্ষা লাভ হয় তাহা যৎসামান্য, উহাকে শিক্ষাই বলা যায় না। জীবনের সকল বিভাগেই এই একটা নিয়ম দেখা যায়, যে অভাব বোধের সঙ্গে সঙ্গে তদুপযোগী ব্যবস্থা হইয়া থাকে। অভিভাবকগণ যখন এই সামান্য শিক্ষাতেই সন্তুষ্ট, তখন আর বালিকা বিদ্যালয় সমূহের উন্নতি কিরূপে হইবে? এরূপ অবস্থায় বালকদিগের সহিত বালিকাগণের একত্র পাঠের রীতি যে পুনরায় প্রচলিত হইতেছে, ইহা আনন্দেরই বিষয়। শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টরের রিপোর্টে দেখা যায় যে ঐ ১,১৬,১১৯ ছাত্রীর মধ্যে অনেকেই বালকদিগের সহিত এক স্কুলে পাঠ করে। বালকবালিকার একত্র পাঠ অন্য কারণে আপত্তিকর হইলেও এ কথা সত্য, যে বালকদিগের বিদ্যালয়ে পাঠ করিয়া বালিকারা শ্রেষ্ঠতর প্রণালীতে শিক্ষালাভের সুযোগ পায়।

যাহা হউক, বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার সূচনা মোটের উপর আশাপ্রদ। উচ্চশিক্ষিতা মহিলাগণ ইতিমধ্যেই দেশের উচ্চ চিন্তাস্রোতে তাঁহাদের প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। অনেকে সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। আমাদের একখানি প্রধান মাসিক পত্রিকা একজন শিক্ষিতা মহিলা কর্তৃক সম্পাদিত হইতেছে। তিনি বুদ্ধি ও ক্ষমতায় পুরুষদিগের অপেক্ষা কোনও অংশে হীন নহেন। অনেক মহিলা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন করিতেছেন, অনেকেই প্রচলিত সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে মনোযোগী হইয়াছেন।

কিন্তু এখনও এদেশবাসীর মনে স্ত্রীলোকদিগের উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে নানাপ্রকার কুসংস্কার বদ্ধমূল রহিয়াছে। এখনও অনেক লোক সংবাদপত্রে, মজলিসে এবং রঙ্গভূমিতে এই সকল উচ্চশিক্ষিতা মহিলাকে উপহাস ও বিদ্রূপ করিয়া থাকে। কিন্তু আমি এই সকল মহিলার অনেকের সহিত সুপরিচিত, প্রায় প্রতিদিন আমাকে ইঁহাদের অনেকের সংস্পর্শে আসিতে হয়। আমি অসঙ্কোচে বলিতে পারি যে, আমরা যে কার্য্যে হাত দিয়াছি, তাহাতে লজ্জিত হইবার অথবা তাহার ভবিষ্যৎ বিষয়ে নিরুৎসাহ হইবার কোন কারণ এ পর্য্যন্ত উপস্থিত হয় নাই। দুই এক স্থলে ভাল অপেক্ষা মন্দের ভাগ কিঞ্চিৎ অধিক হইয়াছে বটে, কিন্তু মোটের উপর এ কথা সত্য যে, আমাদের শিক্ষিত পুরুষদিগের অপেক্ষা শিক্ষিতা স্ত্রীগণ প্রথমেই উৎকৃষ্টতর ফল প্রদর্শন করিয়াছেন। অভিজ্ঞতা ও বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমার এই বিশ্বাস দিন দিন বদ্ধমূল হইতেছে, যে নারীজাতির শিক্ষা ও উন্নতি ভিন্ন হিন্দুসমাজের নৈতিক ও সামাজিক উন্নতি কোনরূপেই সম্ভব নয়। নারীজাতিকে হীন ও অবনত না করিয়া কোন জাতিই নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক হীনতা প্রাপ্ত হইতে পারে না। আমাদিগের নারীগণকে শিক্ষিতা, আত্মসম্মান-বোধ-সম্পন্না, এবং

শ্রদ্ধেয়-চরিত্রা করিয়া তোল, দেখিবে আমাদের জাতীয় শক্তির বিকাশ ও জাতীয় মহত্ত্বলাভ হয় কি না। 'আত্মসম্মান-বোধ-সম্পন্না' এবং 'শ্রদ্ধেয়-চরিত্রা', এই দুইটী কথার প্রতি আমি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। এই দুই বিষয়ে আমাদের নারীদিগের কিরূপ দুর্গতি ঘটিয়াছে, তাহার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর। আমাদের জননী, ও ভগিনীগণকে শক্তি ও সম্মানে হীন করিয়া আমরা তাঁহাদিগকে কিরূপ সামাজিক দুর্গতিগ্রস্ত করিয়াছি, তাহা একবার ভাবিয়া দেখ। সে জন্য কে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে? যে সকল পাপ আমাদের জাতীয় জীবনের মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে অন্তঃসার শূন্য করিয়া ফেলিতেছে, যে নৈতিক মহাব্যাধি দেশের নানা শ্রেণীস্থ লোকের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে বিষাক্ত করিয়া তুলিতেছে সে সমুদয়ের কথা একবার চিন্তা কর। হে শিক্ষিত ভারতবাসী, তোমরা আর কত বিলম্ব করিবে? আর কতকাল তোমাদের সামাজিক জীবনকে উন্নত, মহৎ ও শ্রীসম্পন্ন করিবার সর্ব্বপ্রধান উপায়ের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করিবে?

একটী বিষয় দর্শন করিয়া আমার মন অতি গভীর দুঃখে নিমগ্ন হইতেছে। দেখিতেছি, বর্ত্তমান সময়ে পুনরুত্থানকারিগণ আবার আমাদের নারীদিগকে যেন পশ্চাতে ঠেলিয়া লইয়া যাইতে চাহিতেছেন। তাঁহারা স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে নিরাশার বার্ত্তা প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। যে বন্ধন শিথিল হইয়া যাইবার সূত্রপাত হইয়াছিল, আবার তাহা দৃঢ়তর করিবার চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে; যে অজ্ঞতার যবনিকা নারীগণের সম্মুখ হইতে উত্তোলিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল, আবার তাহা নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা হইতেছে। আমাদের চিরদুঃখিনী, চিরাবনতা, জননী, ভগিনী ও স্ত্রীগণকে পুনরায় দীর্ঘকালব্যাপী অন্ধকারে ও অধীনতায় নিক্ষেপ করিবার প্রয়াস চলিয়াছে। ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি আছে? মিসেস্ আনি বেসান্টকে (Mrs. Annie Besant) আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি, যে তিনি ভারতনারীর পক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, এবং দেশের লোককে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন যে, নারীগণের উন্নতি ব্যতীত কেবলমাত্র পুরুষের উন্নতিতে কোন জাতি মহত্ত্বলাভে সমর্থ হয় না। তাঁহার এই শিক্ষা তাঁহার অনুবর্ত্তিগণের হৃদয়ে স্থানলাভ করুক। প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া এই সংস্কার আমার প্রাণে দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত হইয়াছে, যে দীর্ঘকাল অজ্ঞতা ও অধীনতার মধ্যে বাস করিয়াও, এখনও হিন্দুসমাজে পুরুষ অপেক্ষা নারী অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ রহিয়াছেন। হিন্দুনারীর হৃদয় বহু সদ্‌গুণে ভূষিত। বর্ত্তমানে যে কঠিন ও অবিশ্রান্ত জীবন সংগ্রাম চলিয়াছে, তাহার সমগ্র তীব্রতা সহ্য করিয়াও তিনি নীরবে আপন কর্ত্তব্য সাধন করিয়া চলিয়াছেন। হিন্দুনারীর বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয়, পৃথিবীতে তাঁহার ন্যায় কেহই বুঝি আপনার ন্যায্য সম্মান ও অধিকারে এত বঞ্চিত হয় নাই। যে প্রথা নারীকে এরূপ অধীনতা ও অজ্ঞতায় নিপাতিত করিয়াছে এবং তাঁহাদের মস্তকে এত পুঞ্জীকৃত ক্লেশ আনয়ন করিয়াছে সে রীতি অতি কঠোর, অতি নিষ্ঠুর। যাঁহারা এদেশের স্ত্রীজাতির অবস্থার উন্নতি বিষয়ে মনোযোগী ও যত্নবান হইবেন, তাঁহারাই ভারতের প্রকৃত বন্ধু।

(স্বাক্ষর) শিবনাথ শাস্ত্রী।

মাতৃভূমির দুর্দ্দিনে মহিলা-গণের কর্ত্তব্য।

বিজেতা ও বিজিতের স্বার্থ চিরদিনই পরস্পর-বিরোধী। তবে পরাধীন জাতি সভ্যতা ও ক্ষমতাতে জেতৃগণ অপেক্ষা অত্যন্ত হীন হইলে এবং আপন স্বার্থ নাশের সম্ভাবনা না থাকিলে, বিজেতা কখন কখন বিজিতের কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। ইংরেজ যখন এদেশ জয় করেন, তখন ভারতবাসী জাতীয়তার হিসাবে অতি নিম্ন স্তরে অবস্থিত ছিল। বলগর্ব্বিত ব্রিটিসজাতির পক্ষে, বর্ত্তমান যুগের জ্ঞান

বিজ্ঞানাদিতে অনভিজ্ঞ, সভ্যজাতি সমূহের অগ্রসর চিন্তা বিষয়ে নিতান্ত পশ্চাৎপদ, আত্মকলহে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন এই দুর্ব্বল জাতিকে গ্রাহ্য করিবার কোন বিশিষ্ট কারণ ছিলনা। এই জন্য কৃপাপরবশ হইয়া, স্বীয় স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যতদূর সম্ভব তাঁহারা এদেশের কল্যাণ সাধন করিয়াছেন।

কিন্তু সুসভ্য ইংরেজ জাতির সংস্পর্শে আসিয়া, নানা অনুকূল ঘটনার সাহায্যে, ধীরে ধীরে ভারতের বিচ্ছিন্ন জাতি সমূহ এক মহাজাতিতে পরিণত হইবার সূত্রপাত হইয়াছে; জাতীয় ভাব, জাতীয় একপ্রাণতা এই পতিত জাতিকে অনুপ্রাণিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইংলণ্ডের স্বার্থের প্রতিকূল বলিয়া জাতীয় উত্থানের এই সকল চিহ্ন আমাদের শাসক সম্প্রদায়ের অন্তরে বিষম উদ্বেগের সঞ্চার করিয়াছে। বর্ত্তমান রাজপ্রতিনিধি লর্ড কার্জ্জনের শাসন কালে এই উদ্বেগ অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই জন্যই লর্ড কার্জ্জনের অনুষ্ঠিত বিবিধ কার্য্য পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই, সে সকলের অভ্যন্তরে এদেশবাসীর উন্নতিস্রোত অবরুদ্ধ করিবার প্রয়াস লুক্কায়িত রহিয়াছে। সকল সময়েই মানুষকে নিজের ক্ষুদ্রতা ও শক্তিহীনতার কথা স্মরণ করাইয়া দিলে তাহার আত্মোন্নতির চেষ্টা ক্ষীণ হইয়া পড়ে। লর্ড কার্জ্জন পদে পদে যেন ভারতবাসীকে বলিতেছেন, তোমরা পরাধীন ও কৃপাপাত্র, আমরা রাজার জাতি, তোমাদের জন্য যে ব্যবস্থা করি, মস্তক পাতিয়া তাহা গ্রহণ কর। তিনি আমাদিগকে বুঝাইতে চাহিতেছেন যে, আমাদের হিতাহিত তিনিই আমাদের অপেক্ষা ভাল বুঝিতে পারেন। কিন্তু ভারতবাসী এই রাজনৈতিক পরার্থপরতায় মুগ্ধ হইতেছেন না। কলিকাতা মিউনিসিপাল আইন, বিশ্ববিদ্যালয় আইন, সরকারী গোপনীয় সংবাদ বিষয়ক আইন, রাজকার্য্যে ভারতবাসীর প্রবেশাধিকার সংকোচ, দেশীয় রাজগণের ক্ষমতা হরণ প্রভৃতি বিধানকে ভারতবাসী শাসন-শক্তির নিদারুণ অঙ্কুশাঘাত ব্যতীত আর কিছুই মনে করেন না। সকলের মূলে একই অভিসন্ধি।

রাজনৈতিক আন্দোলনে এদেশে বাঙ্গালীজাতি এখন সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রসর। বঙ্গদেশের প্রাদেশিক ভাষাগুলি দিন দিন সমতা লাভ করিতেছে, রেল ষ্টীমারে যাতায়াত, রাজধানীতে একত্র সম্মিলন, একই শাসকের শাসন, ইংরেজী শিক্ষা ইত্যাদি উপায়ে বাঙ্গালী ক্রমে একটী শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হইতেছে। লর্ড কার্জ্জন বঙ্গদেশকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া এই জাতীয় একতার মূলে প্রচণ্ড কুঠারাঘাত করিলেন। তাঁহার "এক কলমের খোঁচায়" এক উন্নত, শক্তিশালী জাতির অবনতির পথ প্রশস্ত হইল। রাজপুরুষদিগের জেদের সম্মুখে সমগ্র বাঙ্গালী জাতির সুযুক্তিপূর্ণ আবেদন, প্রবল আন্দোলন নিষ্ফল হইল। কয়েক বৎসর হইতে ভারতাকাশে দুর্দ্দিনের যে কালমেঘ সঞ্চিত হইতেছিল আজ তাহা ঘনীভূত হইয়া সমগ্র আকাশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। যে জাতি মস্তক তুলিয়া একটু দণ্ডায়মান হইবার চেষ্টা করিতেছিল, তাহার মহা একপ্রাণতার প্রতি বিদেশী রাজার তীব্র বিরাগ এবং তাচ্ছিল্য সেই চেষ্টা ব্যর্থ করিবার উপক্রম করিয়াছে। পরাধীন জাতির দুর্গতি কত, তাহা এখন এদেশের সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন। মদমত্ত মাতঙ্গ যেমন নিরস্ত্র অসহায় ব্যক্তিকে অবহেলা ভরে মর্দ্দিত করে আমাদের শাসকগণও তেমনি সকল যুক্তি ও অনুনয় উপেক্ষা করিয়া আমাদের জাতীয় কল্যাণকে পদদলিত করিতেছেন।

কিন্তু প্রকৃতই কি আমাদের সকল চেষ্টা নিষ্ফল হইল? কখনই নহে; এক্ষণে বঙ্গদেশকে অবিচ্ছিন্ন রাখা ও আমাদের জাতীয় উন্নতি সাধন আমাদেরই উপর নির্ভর করিতেছে। আমরা একান্তই অসহায় নহি। আমরা জানি ইংরেজ ব্যবসায়ীর জাতি। ব্যবসায়ের উপর তাহার অন্নগ্রাস নির্ভর করিতেছে। বঙ্গদেশে কোটী কোটী টাকার ইংলণ্ডজাত দ্রব্য বিক্রয় হয়। বাঙ্গালী যদি প্রতিজ্ঞা করে যে আমাদের আবেদন নিবেদনের প্রতি কর্ণপাত না করিলে আমরা যথাসম্ভব ইংরেজের দ্রব্য বর্জ্জন করিব, তবে আমরা ইংরেজের ব্যবসায়ের উপর হস্তক্ষেপ করিতে পারি। সমগ্র ইংরেজ জাতি তাহাতে বিচলিত হইবে। ইংলণ্ডের ব্যবসায়ী-

গণের ক্ষমতা অসীম, পার্লামেণ্ট মহাসভা তাহাদের হস্তে যন্ত্র সদৃশ। তাহাদের স্বার্থের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা পার্লামেণ্টের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। এই জন্ম কলিকাতার টাউন হলের বিরাট সভায় বিশ সহস্র বঙ্গবাসী সমবেত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, 'যতদিন গবর্ণমেণ্ট আমাদের আবেদনে কর্ণপাত না করিবেন ততদিন আমরা ইংলণ্ডজাত দ্রব্য যথাসম্ভব বর্জ্জন করিব।' এই দুর্দ্দিনে দেশের সুপুত্রগণ স্বদেশের জন্য যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন, তাহা নির্জ্জীব প্রাণেও আশার সঞ্চার করে। দেশ মধ্যে কি যে এক মহা উত্তেজনা ও উৎসাহ দেখা যাইতেছে তাহা অবর্ণনীয়। স্বদেশের জন্য এই যে আগুন জলিয়াছে তাহার উত্তাপ কি নারীজাতিকে স্পর্শ করিতেছে না? স্বদেশভক্তগণ মাতৃভূমির নামে যে সকল প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, নারীগণেরও কি তাহা পালনীয় নহে? দেশের এই দুর্দ্দিনে নারীগণ যদি পুরুষের সহিত সম্মিলিত না হন তবে আর আশা কোথায়?

বিদেশীয় অশন বসনে অনুরাগ আমাদের অস্থিমজ্জায়, শিরায় শিরায় প্রবেশ করিয়াছে। এতদিন স্বদেশের দ্রব্য তুচ্ছ করিয়া বিদেশীয় দ্রব্যের যে অত্যধিক আদর করিয়াছি, তাহার ফল এক্ষণে দেখিতেছি যে, স্বদেশী শিল্প অনাদরে বিনষ্টপ্রায় হইয়াছে, সামান্য দ্রব্যের জন্যও বিদেশের দ্বারস্থ হইতে বাধ্য হইতেছি। আমরা পূর্ব্ব হইতেই যদি স্বদেশের অনিষ্টকর চাকচিক্যময় বিদেশী দ্রব্যের এত আদর না করিতাম, তাহা হইলে এতদিনে নানা প্রকার প্রয়োজনীয় স্বদেশী দ্রব্য নিশ্চয়ই প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হইতাম। দেশীয় বস্ত্রের প্রতি আমাদের ঘৃণাবশতঃ দেশের তাঁতিকুলের অন্নাভাব উপস্থিত হইয়াছে। আমরাই আমাদের স্বদেশবাসীর ক্ষতি করিয়াছি। এক্ষণে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিতে যাইয়া দেখিতেছি যে, প্রতি পদে বিদেশীর সাহায্য প্রয়োজন। আমরা স্বদেশের অকল্যাণ করিয়া বিদেশের ধনাগমের পথ প্রশস্ত করিতেছি। মহিলাগণ কি স্বদেশের দুঃখে মর্ম্মাহত হইতেছেন না? তাঁহারা কি ইহার নিবারণার্থ কোন উপায় অবলম্বন করিবেন না? এই জাতীয় বিপদে নারীগণ কি স্বদেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিবেন না? যে দেশের তেজস্বিনী, পুণ্যশীলা, মহীয়সী রমণীগণ স্বদেশের কল্যাণের জন্য আপনার কেশ কর্ত্তন করিয়া ধনুকের ছিলা নির্ম্মাণ করিতেন, পতিপুত্রকে উৎসাহের সহিত সম্মুখ সমরে প্রেরণ করিতেন, এমন কি স্বয়ং রণক্ষেত্রে গমন করিয়া স্বদেশের জন্য যুদ্ধ করিতেন, সেই পুণ্যভূমির নারীগণ কি আজ নিস্তেজ, নিষ্প্রভ, প্রাণহীন হইয়া থাকিবেন? তাঁহারা কি স্বদেশের কল্যাণের জন্য "বিদেশীয় বস্ত্র ব্যবহার করিবনা" এই সামান্য প্রতিজ্ঞাটীও করিতে প্রস্তুত হইবেন না? স্বদেশের কল্যাণের জন্য কি আমরা এই সামান্য স্বার্থ ও সামান্য সুখ সুবিধা ত্যাগ করিতে পারিবনা? শত শত বৎসরের পরাধীনতায় আমাদের পুণ্যভূমি জন্মভূমির প্রতি কর্ত্তব্য কি একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছি? বিদেশের বাহ্যিক সুখ সুবিধা পাইয়া আমাদের দরিদ্রা মাতৃভূমির জন্য কি আর প্রাণ কাঁদেনা? মাতার সুপুত্র ও সুকন্যার পক্ষে ইহা কখনই সম্ভবপর নহে।

এই জাতীয় বিপদের সময় একবার জাপানের রমণীগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করি। আমাদের চক্ষের সম্মুখে তাঁহারা কি স্বদেশপ্রেম, কি আত্মত্যাগ দেখাইতেছেন! তাঁহারা স্বদেশের জন্য সকলই বিসর্জ্জন দিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত। জাপানের সম্রাজ্ঞী হইতে পথের ভিখারিণী পর্য্যন্ত সকল রমণীই স্বদেশের সেবা করিতে ব্যাকুল। রাজবংশের যে মহিলা সামান্য দ্রব্যের ভারও বহন করিতে অনভ্যস্ত, তিনিও অম্লানবদনে সকল ক্লেশ সহ্য করিয়া সামান্য সৈনিকের সেবা করিতেছেন। একমাত্র পুত্রের স্বদেশসেবার অন্তরায় বলিয়া মাতা স্বীয় প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেছেন। আমরা কি এবিষয়ে তাঁহাদিগকে এক তিলও অনুসরণ করিতে পারিব না? এই উপস্থিত বিপদ হইতে স্বদেশকে রক্ষা করিবার জন্য সমগ্র দেশে যে জীবন্ত ভাব দৃষ্ট হইতেছে নারীগণ তাহাতে কেন যোগ দান করিবেন না? প্রাতঃস্মরণীয়া তেজোদৃপ্তা আর্য্য রমণীগণের দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া আমরা কেন মৃতের

ন্যায় থাকিব? রমণীগণ স্বদেশানুরাগে পুরুষদিগের পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবেন কেন? তাঁহারা পুরুষদিগের সহিত মিলিত হইয়া স্বদেশের কল্যাণ সাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ না হইলে পুরুষেরা কখনও এই শুভকার্য্যে সিদ্ধি লাভ করিতে সক্ষম হইবেন না। আমরাও তবে স্বদেশ-প্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া প্রতিজ্ঞা করি যে, "স্বদেশী দ্রব্য পাইলে বিদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিবনা এবং যে দ্রব্য স্বদেশে না পাওয়া যায় তাহা অন্য দেশ হইতে ক্রয় করিব, তথাপি ইংলণ্ডজাত দ্রব্য ব্যবহার করিবনা।' জানি প্রতিজ্ঞা করা সহজ কিন্তু প্রতিজ্ঞা পালন অতি কঠিন। চতুর্দ্দিকের বিবিধ বিজাতীয় প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া আমরা যেন প্রতিজ্ঞাভঙ্গ না করি। পূজার বাজার সমাগত, এসময়ে বঙ্গমহিলাগণ একপ্রাণ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া জন্মভূমির নামে প্রতিজ্ঞা করুন যে এবার বিদেশী বস্ত্র ক্রয় করিব না। স্বদেশী সামান্য বস্ত্র বিদেশী বহুমূল্য বস্ত্র অপেক্ষা কি অধিক গৌরবজনক নয়? যখন স্বদেশী বস্ত্র পরিধান করি, তখন 'ইহা আমার দেশের' এই কথা মনে করিয়া কি প্রাণ আনন্দে পূর্ণ হয় না? আমার দেশের সাধারণ বস্ত্র আমাকে যেরূপ গৌরবমণ্ডিত করে, বিদেশী স্বর্ণময় ভূষণ তাহার নিকট কোন্ ছার, কি তুচ্ছ! মাতা, ভগিনী, বন্ধু প্রভৃতি আপন আত্মীয়গণ তাঁহাদের ব্যবহার্য্য বস্ত্র বয়ন করেন, বস্ত্রের জন্য কখনও পরের দ্বারস্থ হইতে হয় না, জাপানী মহিলাগণের নিকট ইহা পরম গৌরবের বিষয়। আমেরিকার দুর্দ্দিনে যখন আমেরিকানেরা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যে ইংলণ্ডজাত দ্রব্য ক্রয় করিবেন না তখন ধনশালিনী, বিলাসিনী আমেরিকান্ মহিলাগণ স্বদেশোৎপন্ন অতি স্থূল বস্ত্র পরিধান করিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিতা মনে করিতেন এবং প্রকৃত পক্ষেও এই কার্য্যদ্বারা তাঁহারা মহিমান্বিতাই হইয়াছিলেন।

এক্ষণে আমাদের দেশে অতি সুন্দর সুন্দর বস্ত্র, নানা প্রকার ছিট, কাঁচি, ছুরী প্রভৃতি প্রস্তুত হইতেছে। প্রথমে স্থির করিতে হইবে যে, বস্ত্র, লবণ, চিনি, দিয়াশলাই প্রভৃতি কয়েকটী বিদেশোৎপন্ন দ্রব্য একেবারেই ব্যবহার করিব না। আমরা যদি দৃঢ়তার সহিত প্রতিজ্ঞা করি যে, অন্ততঃ এই কয়েকটি বিদেশজাত দ্রব্য ব্যবহার করিব না, তাহাতেই অনেক মঙ্গল সাধিত হইবে। চেষ্টা করিলে আমরা নিশ্চয়ই প্রতিজ্ঞা পালনে সমর্থ হইব। আমরা আপনারাই যে কেবল এইরূপে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইব তাহা নহে, কিন্তু যাহাতে আমাদের আত্মীয় স্বজন, প্রতিবাসী এবং গ্রামস্থ সকল মহিলাই এই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হন তাহারও চেষ্টা করিব। পিতা, ভ্রাতা, পতি পুত্রের কল্যাণের জন্য এখনও হিন্দু রমণী কত কঠোর ব্রত ধারণ করেন, কত শারীরিক ক্লেশ, কত উপবাস সহ্য করেন, স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির কল্যাণের নিমিত্ত আমরা আজ এই সামান্য ব্রত ধারণে কেন পশ্চাৎপদ হইব? ব্রতধারণে এবং নিষ্ঠাপূর্ব্বক সেই ব্রত পালনে ভারত-রমণীই কি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অভ্যস্ত নহেন? এই পূজার বাজারে যদি দোকানে দোকানে কোটি কোটি টাকার বিলাতী বস্ত্র অবিক্রীত থাকে তবে অচিরেই বিলাতে প্রবল আন্দোলন উত্থিত হইবে এবং গবর্ণমেণ্ট বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের আদেশ প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হইবেন। অতএব প্রত্যেক গৃহের পুরুষ ও রমণী মিলিত হইয়া, আমাদের প্রতিজ্ঞা কার্য্যে পরিণত করিয়া ধন্য হই, জীবন সার্থক করি। বিদেশীগণ নিরীহ, দুর্ব্বল বাঙ্গালীর স্বদেশপ্রেম, তেজ ও উৎসাহ দেখিয়া, অবাক্ হইয়া যা'ক্। এবার যেন তাহারা আমাদিগকে বাক্যকুশল বাঙ্গালী বলিয়া উপহাস করিবার সুযোগ না পায়। এমন ঘোর বিপদের দিনেও কি আমরা সকলে একপ্রাণ হইয়া প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারিব না? এখনও কি আমরা স্বদেশের দুঃখ দুর্দ্দিনে উদাসীন থাকিয়া বিদেশীর পদলেহন করিব?

তবে একবার জাগিয়া উঠি, একবার সবলে সমুদয় বিঘ্ন অপসারিত করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হই।

শ্রীকুমুদিনী মিত্র।

বৈদিক সমাজ-চিত্র।

প্রথম খণ্ড—মৈত্রেয়ী।

প্রথম অধ্যায়।

বহুদিনের কথা।—যে সময় ব্রহ্মবাদী রাজর্ষি জনক মিথিলায় রাজত্ব করিতেছিলেন, এবং ব্রহ্মজ্ঞানালোচনা দ্বারা দেশকে পবিত্র করিতেছিলেন, সেই সময়ের কথা। জনকপুরের অনতিদূরবর্ত্তী এক বিস্তীর্ণ প্রান্তর দিয়া তিন জন পথিক নগরাভিমুখে আসিতেছেন। তিন জনই দীর্ঘকায় ও বলিষ্ঠ, আধুনিক বেহারবাসী হইতে অতিশয় ভিন্ন। দু'জন অস্ত্রধারী। হস্তে ধনু, পৃষ্ঠে শরাধার সংলগ্ন, কটিতে কোষাচ্ছাদিত তরবারি লম্ববান; ইঁহাদিগকে দেখিলেই ক্ষত্রিয় বলিয়া চেনা যায়। তৃতীয় ব্যক্তির মুখ-গাম্ভীর্য্য, পরিচ্ছদের সারল্য ও ভাষার বিশুদ্ধতা লক্ষ্য করিলে তাঁহাকে সহজেই একজন সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। বস্তুতঃ তিনি মহারাজ জনকের অন্যতম সভাসদ্ সুপ্রসিদ্ধ মিত্রমুনি। আশ্রম জনকপুরের উপনগরে, রাজাদেশে কোন রাজকার্য্য সমাপনান্তে ক্ষত্রিয়দ্বয়ের সঙ্গে আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। পথিক-ত্রয়ের কথাবার্ত্তার কিয়দংশ পাঠককে শুনান আবশ্যক। ক্ষত্রিয়দ্বয়ের মধ্যে একজন মুনিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,——

"আর্য্য, আমি এবার বারাণসী হইতে আ'সা অবধি আপনাকে বড় চিন্তান্বিত দেখিতেছি। আজও লক্ষ্য করিতেছি যে আপনি আমাদের সহিত কথা কহিতে কহিতে ক্ষণে ক্ষণেই অন্যমনস্ক হইতেছেন। ইহার কারণ বলিতে যদি আপত্তি না থাকে, তবে বলিয়া দাসকে অনুগৃহীত করুন।"

মিত্রমুনি।—যজ্ঞদত্ত, তোমাকে ও বিষ্ণুমিত্রকে গোপন করিতে পারি, আমার এমন কোন কথাই নাই। বিষ্ণুমিত্র সেই মহাসভার পর দিনই আমার উদ্বেগ লক্ষ্য করিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে 'পরে বলিব' এই অঙ্গীকার করিয়া এত দিন বলি নাই, এখন তোমাদের দু'জনকেই নির্জ্জনে পাইয়াছি, এখন বলিতে কোন আপত্তি নাই।

যজ্ঞদত্ত।—কোন্ মহাসভার কথা বলিতেছেন? আমি বিদেশে থাকাতে ইহার কিছুই শুনি নাই। সেই যে যজ্ঞের আয়োজন দেখিয়া গিয়াছিলাম, তৎসংক্রান্ত কোন সভার কথা বলিতেছেন কি?

বিষ্ণুমিত্র।—অনুপস্থিতি বশতঃ তুমি বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছ। এমন সভা কখনও দেখি নাই, এমন সভার কথা কখন শুনিও নাই।

যজ্ঞদত্ত।—তাহাতে কে কে বক্তৃতা করেন?

বিষ্ণুমিত্র।—বড় বড় পণ্ডিতদিগের কেহই বাকি ছিলেন না। তবে আর্য্যা গার্গীর বক্তৃতা ও তদুত্তরে মুনিবর যাজ্ঞবল্ক্য যে বক্তৃতা করেন, তাহাই বিশেষ-রূপে উল্লেখ-যোগ্য।

যজ্ঞদত্ত।—কি বিষয়ে আলোচনা হইয়াছিল?

বিষ্ণুমিত্র।—আলোচনার কোন বিশেষ বিষয় স্থিরীকৃত ছিল না। সকলে মুনিবরকে নানা বিষয়ে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। বর্ষাকালীন জলধারার ন্যায় তাঁহার উপর প্রশ্নধারা বর্ষিত হইতে লাগিল। এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া তাঁহাকে নানা বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইল। আর্য্যা গার্গী ব্রহ্মের সর্ব্বব্যাপিত্ব বিষয়ে এবং মুনি উদ্দালক অন্তর্য্যামিত্ব বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। এই প্রশ্নসমূহ ও মুনির উত্তরের সার-মর্ম্ম আমি তোমাকে অবকাশ মত বিস্তৃতরূপে বলিতে পারি। ব্রহ্মস্বরূপের এমন সুন্দর মুগ্ধকর ব্যাখ্যা আমি আর কখনও শুনি নাই।

যজ্ঞদত্ত।—সকলে মিলিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন কেন?

মিত্রমুনি।—প্রথমে তিনি কিছু অবিবেচনার কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহাই আক্রমণের কারণ। যাহা হউক, তা'তে সুফলই ফলিয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্যের বিদ্যা ও কঠোর তপস্যার ফল এমন উজ্জলরূপে আর কখনও প্রকাশিত হয় নাই। তিনি এখনও যুবক, বয়স ৩০ বৎসর

সরকার কয়েক জন সংস্কারকের সাহায্যে বারাসতে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু মহাত্মা বেথুন-প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয়ই প্রধান ও সাধারণের নিকট পরিচিত। এজন্য ইহার নাম অগ্রে উল্লেখ করা হইল। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে বঙ্গের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ইহার প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হন। বঙ্গদেশের তৎকালীন সংস্কারকদিগের অন্যতম নেতা রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় এই বিদ্যালয়ের বাটী নির্ম্মাণার্থ বিস্তৃত একখণ্ড ভূমি দান করেন। তদ্ভিন্ন কলিকাতা সমাজের অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি একার্য্যে অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন ও আপন আপন কন্যাদিগকে এই বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থ পাঠাইয়াছিলেন।

কিন্তু অপর পক্ষে বেথুন-স্কুল স্থাপিত হওয়াতে হিন্দুসমাজের রক্ষণশীল দলের মধ্যে প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হইল। তাঁহারা এই বিদ্যালয়ের অনিষ্টকর ফল সম্বন্ধে নানারূপ ভবিষ্যদ্বাণী করিতে লাগিলেন। সাধারণের মধ্যে নানাপ্রকার ভয়ের সঞ্চার হইল, সংবাদপত্রে সংস্কারকদিগকে বিদ্রূপ করা হইতে লাগিল এবং অনেক স্থলে সামাজিক নির্য্যাতনও আরম্ভ হইল। নির্য্যাতনের কঠোরতা বুঝাইবার জন্য এ স্থলে দুইটী ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে। প্রথম,—বারাসতে স্বর্গীয় প্যারীচরণ সরকার প্রমুখ সংস্কারকদল বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগকে সমাজচ্যুত করা হইয়াছিল। একবার একজন ইংরাজ কর্ম্মচারী সস্ত্রীক উক্ত বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি আদর করিয়া বিদ্যালয়ের একটী ছোট বালিকার চিবুক স্পর্শ করিয়াছিলেন। এই সংবাদ অবিলম্বে স্থানীয় হিন্দুদিগের কর্ণগোচর হইল। তাঁহারা সাহেবের এই কার্য্যকে নিতান্তই গর্হিত ও ভদ্রতাবিরোধী মনে করিলেন এবং সকলে মিলিত হইয়া উক্ত বিদ্যালয়টীর বিনাশ সাধনের উপায় নির্দ্ধারণের জন্য সভা আহ্বান করিলেন।

অপর ঘটনাটী কলিকাতার দক্ষিণস্থ মজিলপুর নামক গ্রামে ঘটিয়াছিল। এই গ্রামে কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ জাতীয় বহু লোকের বাস। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে কতিপয় সহৃদয় ব্যক্তি মিলিত হইয়া এই গ্রামে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিতে সচেষ্ট হন। এজন্য একটি উপযুক্ত গৃহ স্থির করা হইল, শিক্ষক নিয়োগ প্রভৃতি সকল আয়োজনই সুসম্পন্ন হইল। কিন্তু গ্রামের কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ বিদ্যালয় সংস্থাপনের বিরোধী হইয়া দাঁড়াইলেন। এই বিরুদ্ধ অন্দোলনে গ্রামস্থ লোকের মন এমনই উত্যক্ত হইয়া উঠিল যে, অচিরেই সকল সংকল্প পরিত্যাগ করিবার উপক্রম হইল। কিন্তু সেই সময় গ্রামের কোনও সম্পন্ন পরিবারের একটী যুবকের সাহায্যে এই বিপত্তি নিবারণ হয়। ইনি একটু 'মাথা পাগলা' রকমের লোক ছিলেন। ইঁহার একটী ডালকুত্তা বা বুলডগ্ ছিল। কাহারও প্রতি বিরক্ত হইলে এই ডালকুত্তা লেলাইয়া দিতেন। এ জন্য তাঁহাকে ও তাঁহার কুকুরকে সকলেই ভয় করিত। সৌভাগ্যক্রমে স্কুল স্থাপন বিষয়ে সংস্কারকদিগকে সাহায্য করিবার জন্য তাঁহার ইচ্ছা হইল। তিনি কুকুর লইয়া লোকের বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়া বালিকাদিগের অভিভাবকদিগকে স্ত্রী-শিক্ষার আবশ্যকতা বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন এবং পারিতোষিক ও উপহারাদির প্রলোভন দেখাইতে লাগিলেন। অবশেষে সকল আপত্তির অবসান হইল। কেহ পারিতোষিক ও উপহার প্রভৃতির লোভে, কেহ বা ঐ কুকুরের ভয়ে স্বীয় কন্যাগণকে বিদ্যালয়ে পাঠাইতে সম্মত হইলেন। অবশেষে বিদ্যালয় স্থাপিত হইল, এবং কিয়ৎকাল বেশ সচ্ছলভাবেই চলিতে লাগিল। কিন্তু উপহারাদির ব্যয়াধিক্য ও গ্রামের জমিদারদিগের বিরোধিতায় কয়েক বৎসরের মধ্যেই বিদ্যালয়টী উঠিয়া যাইবার উপক্রম হয়। তখন ব্রাহ্মগণ ইহার কার্য্যভার গ্রহণ করেন এবং তাঁহাদেরই যত্নে ও পরিশ্রমে উহা মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পায়।

যাহা হউক, কলিকাতায় বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের অল্পকাল পরেই মহাত্মা বেথুন রাজকার্যে

অতিশয় ব্যাপৃত হইয়া পড়েন। মফঃস্বলের নানা স্থানে সাহেবগণ দেশীয় লোকদিগকে নানাপ্রকারে নির্য্যাতন করিত। সেই নির্য্যাতনের হাত হইতে এদেশবাসীকে রক্ষা করিবার জন্য মহাত্মা বেথুন আইন প্রণয়নে মনোনিবেশ করেন। কিন্তু গুরু পরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হয় এবং ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ১২ই আগষ্ট তারিখে তিনি লোকান্তর গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার হস্তে যে অর্থ ছিল, তাহার অধিকাংশই স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য উইল করিয়া দিয়া যান। মহাত্মা বেথুন যে বীজ বপন করিয়া গেলেন, ক্রমে তাহা অঙ্কুরিত হইতে লাগিল। সংস্কারকগণ নানাস্থানে,—কলিকাতার দূরবর্ত্তী পল্লীগ্রাম সমূহেও—বলিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিতে লাগিলেন।

তৎপর ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে আর এক নূতন ক্ষেত্রে, নূতন প্রণালীতে কার্য্য আরম্ভ হয়। সংস্কারকদল দেখিলেন, বাল্য বিবাহের অত্যাচারে বালিকাদিগকে দশ বৎসর বয়সেই বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে হয়, তৎপর আর তাহাদের শিক্ষার কোনও বন্দোবস্ত থাকে না। তজ্জন্য তাঁহারা অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁহার বন্ধুগণ মিলিত হইয়া "ব্রাহ্মবন্ধু" সভা নামে একটী সভা স্থাপন করিলেন। অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাগণের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার এই সভার এক প্রধান কার্য্য হইল। ইহার সভ্যগণ পাঠ্য পুস্তক নির্দ্ধারণ ও বৎসরান্তে পরীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক পারদর্শিতানুযায়ী বৃত্তি ও পুরস্কারের ব্যবস্থা করিতেন। এই সময়ে কয়েক জন ব্রাহ্মবন্ধু উদ্যোগী হইয়া 'বামাবোধিনী পত্রিকা' নামে একখানি স্ত্রীপাঠ্য মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। উক্ত পত্রিকাখানি এখনও জীবিত রহিয়াছে এবং ইহার প্রথম সম্পাদক দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে।

অনতিবিলম্বে আর এক দল লোক এই কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বালিউত্তরপাড়ার কতিপয় শিক্ষিত ব্যক্তি সম্মিলিত হইয়া 'উত্তর পাড়া হিতকরী সভা' নামে এক সভা স্থাপন করেন। এই সভাও পূর্ব্বকথিত প্রণালীতে বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণান্তর বৃত্তি ও পুরস্কার প্রদান করিত।

তৎপর ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন বয়ঃস্থা মহিলাগণের জন্য একটী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণের অনেকেই সন্তানবতী রমণী ছিলেন। বাটীর পুরুষেরা কাজ কর্ম্মে বহির্গত হইলে গৃহকর্ম্মাদি সম্পন্ন করিয়া তাঁহারা প্রতিদিন মধ্যাহ্নে শিক্ষালাভের জন্য সম্মিলিত হইতেন। এই বিদ্যালয়ে কেশবচন্দ্রের আদর্শানুযায়ী যে শিক্ষা প্রদত্ত হইত তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রণালী হইতে অনেক বিষয়ে বিভিন্ন ছিল। কিন্তু এক দল ব্রাহ্ম কেশবচন্দ্রের অবলম্বিত প্রণালী অপেক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রণালীকেই শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন। তাঁহারা পরবর্ত্তী বৎসরে অর্থাৎ ১৮৭৩ সনে "বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়" নামে আর একটী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। উহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ অনুসরণ করা হইত। এই উভয় বিদ্যালয় কিছু দিন স্বীয় স্বীয় ক্ষেত্রে অতি উত্তমরূপ কার্য্য করিয়াছিল। কিন্তু কয়েক বৎসর পরে কেশব চন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টী উঠিয়া যায়, আর "বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়" বেথুন স্কুলের সহিত মিলিত হইয়া "বেথুন কলেজ" নাম ধারণ করে। এ স্থলে আরও কয়েকটী সভার উল্লেখ করা প্রয়োজন। ১৮৭৮ হইতে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে যশোহর, খুলনা, বিক্রমপুর, শ্রীহট্ট প্রভৃতি নানাস্থানে সেই সকল স্থানের নামানুসারে কতকগুলি সভা সংস্থাপিত হয়। স্ত্রীশিক্ষাপ্রচলনই উহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই সকল সভা পূর্ব্বকথিত "ব্রাহ্মবন্ধু" সভার প্রণালী অনুসরণ করিত। বৎসরান্তে পরীক্ষা গৃহীত এবং পারিতোষিকাদি বিতরিত হইত। এই সকল সভা দ্বারা দেশ মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের যথেষ্ট সাহায্য হইয়াছে এবং লোকের মন হইতে স্ত্রীশিক্ষাসম্বন্ধীয় প্রাচীন সংস্কার সমূহও বহু পরিমাণে দূরীভূত হইয়াছে।

এক্ষণে এই সকল উদ্যমের ফল কি হইয়াছে তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি। এই সকল চেষ্টা যে বিফল হইয়াছে তাহা নহে, কিন্তু আশানুরূপ ফলও ফলে নাই। শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টরের গত বৎসরের রিপোর্টে দেখিতে পাই বিগত বৎসর সর্ব্বসমেত ১,১৬,১৬৯ বালিকা শিক্ষাধীন ছিল, তৎপূর্ব্ব বৎসর ৯৬,০৫০ বালিকা শিক্ষা পাইয়াছিল।

মাত্র। এই বয়সেই যাঁহার প্রতিভার তেজ এত অধিক তিনি প্রৌঢ়ত্ব প্রাপ্ত হইলে কি অসাধারণ লোক হইবেন, কে জানে? আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাঁহার গুরু বৈশম্পায়ন এমন উপযুক্ত শিষ্যের গৌরবে আপনাকে গৌরবান্বিত বোধ না করিয়া তাঁহার সহিত বিবাদ করিলেন আর তাঁহাকে শিষ্যের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিলেন।

যজ্ঞদত্ত।—তাহাতে যাজ্ঞবল্ক্যের কোন ক্ষতি হইবে বলিয়া আমার বোধ হয় না। আর, আমাদেরও কোন ক্ষতিই নাই। বৈশম্পায়ন মুনির অধ্যাপিত বেদকে যাজ্ঞবল্ক্য যে "কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ" বলিয়াছেন, তাহা বস্তুতঃই সত্য। আমি সে বেদ, তাঁহার কোন কোন শিষ্যের মুখে শুনিয়াছি। তাহাতে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ এমন অদ্ভুতরূপে মিশ্রিত যে তাহার ভিতর প্রবেশ করা ও অন্ধকার গৃহে প্রবেশ করা দুইই সমান। এমন বেদকে "কৃষ্ণ" বলাতে কিছুই অন্যায় হয় নাই। মুনিবর আপনার সাহায্যে যে বেদবিভাগ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, আশা করি তাহা শেষ হইলে সেই সুসংস্কৃতবেদ "শুক্ল" নামেরই উপযুক্ত হইবে। যাহা হউক, এই বিষয় আপনার কাছে আরও বিশেষ ভাবে শুনিবার ইচ্ছা আছে। এখন জিজ্ঞাসা করি বিষ্ণুমিত্র যে "প্রশ্নধারার" কথা বলিলেন, কি উপলক্ষে মুনিবরের উপর সেই প্রশ্নধারা বর্ষিত হইয়াছিল।

মিত্রমুনি।—মহারাজ সুবর্ণমণ্ডিত শৃঙ্গযুক্ত এক সহস্র গো যজ্ঞভূমির নিকট স্থাপন করিয়া সভাস্থ পণ্ডিতবর্গকে বলিলেন, আপনাদের মধ্যে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞ, তিনি এই গোধন গ্রহণ করুন্।

যজ্ঞ।—কি অদ্ভুত কথা! কে আপনাকে ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া পরিচয় দিতে যাইবে?

মিত্রমুনি।—তাই বলিতেছিলাম যাজ্ঞবল্ক্য কিছু অবিবেচনার কার্য্য করিয়াছিলেন। তুমি জান, গোধন তাঁহার বড় প্রিয়, এটা তাঁ'র একটা দুর্ব্বলতা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তিনি যখন দেখিলেন কেহ কিছু বলিতেছেন না, সভা অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ রহিল, তখন তিনি তাঁহার জনৈক শিষ্যকে বলিলেন, বৎস, এই গোধন আমার গোগৃহে লইয়া যাও।

যজ্ঞ।—কি আশ্চর্য্য!

মিত্রমুনি।—সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন ও পরস্পরের মধ্যে অর্দ্ধস্ফুটভাবে কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য সকলের ভাব বুঝিয়া বলিলেন, 'আমি ব্রহ্মজ্ঞের চরণে প্রণত হই। কেহ এই গোধন গ্রহণ করিতেছেন না, আমি গোধন বড় ভালবাসি, তাই লইতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।' একজন দাঁড়াইয়া বলিলেন, 'আপনি আমাদের প্রশ্নের উপযুক্ত উত্তর দান করিতে পারিলে নিরাপত্তিতে গোধন গ্রহণ করিতে পারেন।' যাজ্ঞবল্ক্য প্রশ্নের উত্তর দানে স্বীকৃত হওয়া মাত্রই তাঁহার উপর বিষ্ণুমিত্রের বর্ণিত "প্রশ্ন-ধারা" বর্ষিত হইতে লাগিল। তুমি অবকাশ মত বিষ্ণুমিত্রের নিকট সমস্ত ব্যাপার শুনিও।

যজ্ঞ।—হাঁ, অতি আগ্রহের সহিত শুনিব। এখন আমার মূল প্রশ্নের উত্তর দিন। সভার কথা জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া সেই প্রশ্ন ভুলিয়া যাইতেছিলাম। আপনার এই বিষণ্ণতার কারণ জানিতে ইচ্ছা করি। সেই সভার সহিতই বা তাহার সম্পর্ক কি?

মিত্রমুনি।—বিষণ্ণতার কারণ আমার কন্যা। সে ষোড়শ বৎসর অতিক্রম করিয়াছে, এখন আমি তাহাকে পাত্রস্থ করিতে ইচ্ছা করি, কিন্তু এই বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছি না।

বিষ্ণুমিত্র।—ইহার কারণ কি? আপনার কন্যার ন্যায় রূপবতী, সুশীলা কন্যা অতি দুর্লভ। তা'রপর, আপনি তাঁহাকে যেরূপ শিক্ষা দিয়াছেন সেরূপ শিক্ষা প্রায় কোন মহিলা প্রাপ্ত হন না। আমি অনেকবার বন্ধুদিগকে বলিয়াছি যে মৈত্রেয়ী অচিরে স্বীয় মাতৃস্বসা গার্গী দেবীর ন্যায় প্রসিদ্ধ ব্রহ্মবাদিনী ও বাগ্মিনী হইয়া উঠিবেন। এমন কন্যার আবার পাত্রের অভাব? আমাদের নগর ত বিদ্বান্ যুবকে পরিপূর্ণ।

মিত্রমুনি।—বিদ্বান্ সুশীল যুবকের অভাব নাই। আমার অকৃতকার্য্যতার কারণ তাহা নহে। তুমি মৈত্রেয়ীর

যে শিক্ষার প্রশংসা করিতেছ, তাহাই তাঁহার বিবাহের প্রতিবন্ধক।

যজ্ঞ।—সে কিরূপ ?

মিত্রমুনি।—তোমারা জান, বৈশম্পায়ন মুনির সহিত বিবাদের পর হইতে যাজ্ঞবল্ক্য আমার সহিত বেদবিভাগে ব্যস্ত। এই উপলক্ষে আমার গৃহে প্রতিদিন একটী ক্ষুদ্র সমিতি বসে। অনেক সময়ই মূল কার্য্য রাখিয়া দিয়া আমরা ব্রহ্মজ্ঞানালোচনায় প্রবৃত্ত হই। এই আলোচনা এমন মধুর ও আত্মার উপকারপ্রদ হয় যে, আমরা ইহাতে মগ্ন হইয়া অনেক সময়ই আহার নিদ্রা ভুলিয়া যাই। গার্গী প্রায় সর্ব্বদাই এই সমিতিতে উপস্থিত থাকেন। আমার কন্যা মাসীর নিতান্ত ভক্ত, তাহা তোমরা জান। মাসী যেখানে, সেও সেখানে। সেই মহাসভার দিনেও সে মাসীর আঁচল ধরিয়া সভায় গিয়া উপস্থিত। গার্গীর আসন পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। কাজেই বাধ্য হইয়া তাঁহাকে মাসীর আঁচল ছাড়িয়া অন্য মহিলাদের সহিত স্বতন্ত্র স্থানে বসিতে হইল। সে যাক্, এখন আমার কথাটা এই যে, কন্যা অতি অল্পবয়স্কা, সে যে আমাদের কথা বার্ত্তা এত বুঝে তাহা আমি পূর্ব্বে মনে করি নাই। এখন দেখিতেছি সে এই সকল কথা লইয়া সমস্ত দিনই কাটায়। তাঁহার এই জ্ঞান-নিষ্ঠা বিবাহের প্রতিবন্ধক হইয়া উঠিয়াছে।

বিষ্ণু।—এতো আর যার তার কন্যা নয়। আপনার কন্যা ষোড়শ বৎসরে ব্রহ্মবাদিনী হইবে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যাহা হউক, আমার ভবিষ্যদ্বাণী বুঝি সফল হইতে যায়। তিনি বুঝি মাসীর ন্যায় ব্রহ্মচারিণী হইতে চান ?

মিত্রমুনি। প্রায় তাহাই। সে বলে, 'আমি মাসীর ন্যায় চির ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিব, না হয়, যদি আয়োজন করিতে পার, আমি যাজ্ঞবল্ক্য মুনির গৃহিণী হইব। সেই সভার দিন হইতে তাহার এই ভাব বিশেষরূপে প্রবল হইয়াছে। সেই সভার সহিত আমার বিষণ্ণতার এই সম্বন্ধ।

যজ্ঞ।—এ ত বেশ কথা। যাজ্ঞবল্ক্য মুনি আহ্লাদের সহিত আপনার কন্যা গ্রহণ করিবেন।

মিত্রমুনি।—তাঁহার ঘরের কথা বোধ হয় তুমি জান না, তাই ওরূপ বলিতেছ। অবশ্য জান যে যাজ্ঞবল্ক্য বিবাহিত। তিনি আমার পরম সুহৃদ্ কত্যমুনির কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন। এই কন্যা প্রায় সর্ব্বাংশে তাঁহার উপযুক্তা পত্নী। তিনি পরম রূপবতী, গৃহকার্য্যে অতি সুদক্ষা, বিশেষতঃ তাঁহার স্বভাব এমন মধুর যে, তাঁহাকে একবার দেখিলেই তাঁহার মূর্ত্তি চিরদিনের জন্য হৃদয়পটে অঙ্কিত হইয়া যায়। আমি যখনই তাঁহাদের বাটীতে যাই, তিনি এমন মধুর বাক্যে আমাকে সম্ভাষণ করেন, তাঁহার সুন্দর বদন ভক্তি ও প্রীতি ব্যঞ্জক এমন মধুর হাস্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠে, যে আমি তাঁহাকে দেব-কন্যা ব্যতীত আর কিছুই ভাবিতে পারি না। শুনা যায়, যাজ্ঞবল্ক্য এই সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা পত্নীতে অতিশয় আসক্ত। আমি এমন গার্হস্থ্য সুখে কণ্টকারোপণ করিতে চাই না। বিশেষতঃ আমার কন্যা অল্পবয়স্কা ও অনভিজ্ঞা। কিসে কি ঘটাইবে জানি না।

বিষ্ণু।—আপনি কাত্যায়নী দেবীর গুণ বর্ণনা করিতে যাইয়া একটা 'প্রায়' কথা ব্যবহার করিলেন, ইহার অর্থ কিন্তু বুঝাইলেন না।

মিত্রমুনি।—(সহাস্যে) সেই 'প্রায়' কথাটার সার্থকতা এই যে, কাত্যায়নী অন্য সকল বিষয়ে উপযুক্তা হইয়াও ব্রহ্মবিদ্যায় অনুরাগিণী নহেন। তিনি গৃহকার্য্য, পতিসেবা ও সন্তানগণের তত্ত্বাবধানেই সর্ব্বদা ব্যস্ত, জ্ঞানালোচনায় তাঁহার উৎসাহ নাই।

যজ্ঞ।—তাহা হইলে ত তাঁহার গৃহে আমাদের মৈত্রেয়ীর যথেষ্ট স্থান রহিয়াছে। তাঁহার সুখের যে অংশটুকু কাত্যায়নী দেবী অপূর্ণ রাখিয়াছেন, মৈত্রেয়ী সেটুকু পূর্ণ করিবেন।

মিত্রমুনি।—সে প্রস্তাব অন্যে কিরূপে করিবে ?

এই কথা বলিতে বলিতেই মিত্র মুনি থামিলেন। অনেকক্ষণ পূর্ব্বেই পথিকগণ একটী অরণ্য ও শৈলময় পথে প্রবেশ করিয়াছিলেন। মিত্রমুনি যাহা দেখিয়া থামিলেন তাহা এই;—বৃক্ষরাজি-বেষ্টিত একটী ক্ষুদ্র শৈলোপরি যাজ্ঞবল্ক্য উপবিষ্ট। শরীর সম্পূর্ণরূপ নিশ্চল,

আত্মা সমাধি-সাগরের কত গভীর দেশে নিমগ্ন হইয়াছে তাহা কে বলিবে? মিত্রমুনি কিঞ্চিৎ দূর হইতেই ধ্যানমগ্ন ব্যক্তিকে দেখিয়াছিলেন ও চিনিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। কাছে আসিয়া চিনিতে পারিয়া দাঁড়াইলেন; দাঁড়াইয়াই দেখিলেন মুনিবর আসন্ন বিপদ্‌গ্রস্ত। একটা বৃহদাকার ভীষণ ব্যাঘ্র ধীর পদে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছে, ধ্যানমগ্ন ঋষি তাহার কিছুই জানেন না। মিত্র তৎক্ষণাৎ ক্ষত্রিয়দ্বয়কে এই বিপদ দেখাইলেন। তাঁহারা মুহূর্তমধ্যে শর সন্ধান করিলেন। প্রথম নিক্ষিপ্ত দুই শর ব্যাঘ্রের চক্ষুদ্বয় বিদ্ধ করিল ও তাহাকে নিশ্চল করিল। দ্বিতীয় বারের নিক্ষিপ্ত শরদ্বয় তাহার বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ হইল। পর মুহূর্তেই তাঁহারা ধূলিলুণ্ঠিত ব্যাঘ্রের নিকটবর্ত্তী হইলেন ও তরবারি দ্বারা তাহাকে দ্বিখণ্ডিত করিলেন। ধ্যানমগ্ন ঋষি উত্থিত হইয়া মুহূর্তের মধ্যে সমুদায় বুঝিলেন এবং গভীর কৃতজ্ঞতাভরে মুনির পাদ বন্দনা ও ক্ষত্রিয়দ্বয়কে আলিঙ্গন করিলেন। তিনি বারবার বন্ধুত্রয়ের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, সেই ভয়সঙ্কুল স্থানে আর বিলম্ব না করিয়া সকলে দ্রুতপদে নগরাভিমুখে চলিলেন এবং নগর প্রান্তে উপস্থিত হইয়া পরস্পরের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীসীতানাথ তত্ত্বভূষণ।

সোণার বাংলা।

বাউলের সুর—একতালা।

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি॥
ওমা ফাগুনে তোর আমের বনে
ঘ্রাণে পাগল করে, (মরি হায় হায়রে)।
ওমা অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে
কি দেখেছি মধুর হাসি॥

কি শোভা কি ছায়া গো,
কি স্নেহ কি মায়া গো,
কি আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে
নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে
লাগে সুধার মত (মরি হায় হায়রে)—
মা তোর বদনখানি মলিন হলে
আমি নয়নজলে ভাসি॥

তোমার এই খেলাঘরে
শিশুকাল কাটিল রে,
তোমারি ধূলামাটি অঙ্গে মাখি
ধন্য জীবন মানি।
তুই দিন ফুরালে সন্ধ্যাকালে
কি দীপ জ্বালিস্ ঘরে (মরি হায় হায়রে)—
তখন খেলা ধূলা সকল ফেলে
তোমার কোলে ছুটে আসি॥

ধেনু-চরা তোমার মাঠে,
পারে যাবার খেয়া ঘাটে,
সারাদিন পাখী-ডাকা ছায়ায় ঢাকা
তোমার পল্লিবাটে,—
তোমার ধানে ভরা আঙিনাতে
জীবনের দিন কাটে (মরি হায় হায়রে)—
ওমা আমার যে ভাই তারা সবাই
তোমার রাখাল তোমার চাষী॥

ওমা তোর চরণেতে
দিলেম এই মাথা পেতে
দেগো তোর পায়ের ধূলো সে যে আমার
মাথার মাণিক হবে।
ওমা গরীবের ধন যা আছে তাই
দিব চরণতলে (মরি হায় হায়রে)
আমি পরের ঘরে কিনব না তোর
ভূষণ বলে গলার ফাঁসি॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্বরলিপি।

*৩ ০ ১ ২´
মা মাঃ -পঃ II গা মাঃ -গঃ। রসা -া -রসা। ণ্সা -া -ণ্ধ্া।
(আস্থায়ী) আ মা -র্ সো ণা -র্ বা০ ০ ০ঃ লা,- ০ ০০

৩ ০ ১ ২´ ৩
। -া ধ্া ণ্া I সা সরা গা। -া রা সরা। ণ্া সা -া। -া -রা গা I
০ আ মি তো মা- ০ র্ ভা ল- বা সি। ০ ০ ০ ০

০ ১ ২´ ৩
I -রগঃরঃ -সা সরগমা। মা মাঃ -পঃ। গা মাঃ গঃ। রসা -া -রসা I
০ ০ ০ ০ ০০০০ আ মা -র্ সো ণা র্ বা০ ০ ০ঃ

০ ১ ২´ ৩
I ণ্সা -া -ণ্ধ্া। -া ধ্া ণ্া। সা সরা গা। -া রা সরা I
লা০ ০ ০০ ০ আ মি তো মা০ ০ র্ ভা ল০

০ ১ ২´ ৩
I ণ্া সা -া। -া রা গা। -রগঃ রঃ -সা { সা। সা সা -া I
বা সি ০ ০ ০ ০ ০০ ০ ০ { চি র দিন্

০ ১ ২´ ২´ ৩
I রা মা -া। পা পা -া। (-া -া) } পা পা -ধা। পা মা গা I
তো মা র্ আ কা শ্ } তো মা র্ বা তা স্

০ ১ ২´ ৩
I পা পা -ণা। ধা পা -া। -া -া -া। -া র্সা র্সর্া I
আ মা র্ প্রা ণে ০ ০ ০ ০ ০ ও মা০

০ ১ ২´ ৩
I ণর্সা ণাঃ -ণধঃ। ণধা পা -ধপা। মপঃ -ঃ গা -া। গা গমা -পা II
আ মা ০র্ প্রা ণে ০০ বা০ ০ জা য়্ বাঁ শি। ০

II { গা মাঃ -গঃ। রসা -া -রসা। ণ্সা -া ণ্ধা। -া ধ্া ণা I
{ সো ণা -র্ বা০ ০ ০ঃ লা০ ০ ০০ ০ আ মি

I সা সরা -গা। -া রা সরা। ণ্ সা -া। -া রা গা I
তো মা০ ০ য়্ ভা ল০ বা সি ০ ০ ০ ০

* গানের প্রথম পংক্তিটির পুনরাবৃত্তির সময় তালাঘাতগুলি স্থানভ্রষ্ট হয়, এই জন্য পুনরাবৃত্তির চিহ্ন না দিয়া বিস্তৃত ভাবে লিখিত হইল। অতঃপর তালের চিহ্ন বর্জ্জন করিয়া পুনরাবৃত্তির চিহ্ন যোগে সংক্ষেপেই লেখা হইবে। উপরকার আদর্শ দৃষ্টে তালের হিসাব স্থির করিয়া লইবেন।

RARE BOOK
Inb. 3925, dt. 27/8/09

				৩	
	I র্গঃ রঃ -সা (-সরগমা ।	মা মাঃ পঃ)	} -া ।	-া	পা পা I
	০০ ০ ০ ০০০০	আ মা -র্	} ০	০ (অন্তরা)	ও মা
				০ (আভোগ)	মা তোর্

	০	১	২´	৩
	I { মা ধা -া ।	ধা ধা -না ।	না র্সা -র্গা ।	র্রা র্সা -া I
(অন্তরা)	{ ফা গু ০	নে তো -র্	আ মে -র্	ব নে ০
(আভোগ)	মু খে র্	বা নী ০	আ মা -র্	কা নে ০

	০	১	২´	৩
	I না নর্সঃ নঃ ধা ।	-া ধা না ।	না র্সা -া ।	-া র্রা র্গা I
(অন্তরা)	ঘ্রা ণে ০ ০ ০	০ পা গল্	ক রে, ০	০ ০ ০
(আভোগ)	লা গে ০ ০ ০	০ সু ধার্	ম ত, ০	০ ০ ০

	০	১	২´	৩
	I র্রগঃ র্ সা -া ।	-া না না ।	ধা না -া ।	-া -া -া I
(অন্তরা)	০ ০ ০ ০ ০	০ (ম রি	হা ০ ০	০ ০ য়্
(আভোগ)	০ ০ ০ ০ ০	০ (ম রি	হা ০ ০	০ ০ য়্

	০	১	২´	৩
	I ধনা -র্সা র্সা ।	না ধা -পা ।	মা ধা -া ।	ধা ধা -না I
(অন্তরা)	হা ০ য়্ রে)	ও মা ০	ফা গু ০	নে তো র্
(আভোগ)	হা ০ য়্ রে)	মা তো -র্	মু খের্	বা ণী ০

	০	১	২´	৩
	I না র্সা র্গা ।	র্রা র্সা -া ।	না নর্সঃ নঃ ধা ।	-া ধা না I
(অন্তরা)	আ মে র্	ব নে ০	ঘ্রা ণে ০ ০ ০	০ পা গল্
(আভোগ)	আ মা র্	কা নে ০	লা গে ০ ০ ০	০ সু ধার্

	০	১	২´	৩
	I না র্সা -া ।	-া র্রা -র্গা ।	র্রগঃ র্রঃ -র্সা -া ।	-া না না I
(অন্তরা)	ক রে, ০	০ ০ ০	০ ০ ০ ০ ০	০ ও মা
(আভোগ)	ম ত, ০	০ ০ ০	০ ০ ০ ০ ০	০ মা তোর্

	০	১	২´	৩
	I না -র্সা র্সা ।	র্সা র্সাঃ -র্রঃ ।	র্সা ণা -ধণঃ ধঃ ।	-পা ধা না I
(অন্তরা)	অ ০ ঘ্রা	ণে তো -র্	ভ রা ০ ০ ০	০ ও মা
(আভোগ)	ব দ ন্	খা নি ০	ম লি ০ ০ ০	ন্ মা তোর্

০ ১ ২´ ৩
I র্ন -র্সা র্সা। র্সা র্সাঃ -র্রঃ। নর্সা ণা -া। ধা পা মা I
(অন্তরা) অ ০ ন্ত্রা নে তো র্ ভ রা ০ ক্ষে তে ০
(আভোগ) ব দ -ন্ খা নি ০ ম লি ন্ হ লে ০

০ ১ ২´ ৩
I পধা -ণা ণা। ধা পা -া। -া -া -া। -া র্সা র্সর্রা I
(অন্তরা) কি ০ ০ দে খে ছি ০ ০ ০ ০ ০ ও মা ০
পধণা
(আভোগ) আ মি ০ ন য় ০ ০ ০ ০ ন্ ও মা ০

০ ১ ২´ ৩
I নর্সা ণাঃ -ণধঃ। পধা পা -ধপা। মপঃ -ঃ গা -া। গা গমা -পা II
(অন্তরা) কি দে ০ ০ খে ছি ০ ০ ম ০ ০ ধু র হা সি। ০
(আভোগ) আ মি ০ ০ ন য় ০ ন্ জ ০ ০ লে ০ ভা সি। ০

II { গা মাঃ -গঃ। রসা -া -রসা। ণ্সা -া ণ্ধ্া। -া ধ্া ণ্া I
{ সো ণা -র বা ০ ০ ০ ং লা ০ ০ ০ ০ ০ আ মি

I সা সরা -গা। -া রা সরা। ণ্া সা -া। -া -রা -গা I
তো মা ০ ০ য় ভা ল ০ বা সি ০ ০ ০

I রগঃ রঃ -সা (-সরগমা। মা মাঃ পঃ) } -া। -া -া -া I

০ ১ ২´ ৩
I { া া সা। সা সা -রা। ণ্া -সা রা। সা নধ্া -া I
{ (সঞ্চারী) কি শো ভা ০ কি ০ ছা য়া গো ০ ০

০ ১ ২´ ৩
I -া -া ধ্া। ধ্া ধ্া ণ্া। সা -গা -গা। গা গমগমা -পঃ পমঃ I
০ ০ কি স্নে হ ০ কি ০ মা য়া গো ০ ০ ০ ০ ০ ০

০ ১ ২´ ৩
I -গা -া গা। গা সা -া। গা গা -া। মা মপাঃ -মঃ I
০ ০ কি আঁ চ -ল্ বি ছা ০ য়ে ছ ০

০ ১ ২´ ৩
I মা গা -া। সা গা -া। গমা গা -া। রা সা রসা I
ব টে র্ মূ লে ০ ন দী -র্ কূ লে ০ ০

০ ১ ২´ ৩
I ন্া সা -া। -া -রা -গা। রগঃ রঃ সা -া। -া -া -া।) }
কূ লে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

গানের অবশিষ্ট অংশগুলি সঞ্চারী এবং আভোগরূপে ক্রমান্বয়ে গেয়।

শ্রীউপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।

গুঞ্জন।

সম্প্রতি বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখক ও কবি রবীন্দ্রনাথ এবং প্রতিভাশালিনী কবি "আলো ও ছায়া" রচয়িত্রী শিশুদিগের জন্য দুইখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থখানির নাম "শিশু", "আলো ও ছায়া" রচয়িত্রীর গ্রন্থখানির নাম "গুঞ্জন"। রবীন্দ্র বাবুর "শিশু" সরল কবিতার এক অভিনব সৌন্দর্য্য ও মিষ্টতায় আমাদের চিত্তকে কিরূপ আকৃষ্ট করিয়াছে, তাহা স্বতন্ত্র একটি প্রবন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। সম্প্রতি আমরা "আলো ও ছায়া" রচয়িত্রীর "গুঞ্জন" প্রাপ্ত হইয়া যে আনন্দলাভ করিয়াছি, তাহাই এই প্রবন্ধে প্রকাশ করিব।

এই "গুঞ্জন" গ্রন্থের লেখিকা সাহিত্য সমাজে সুপরিচিতা; তিনি একমাত্র "আলো ও ছায়া" রচনা করিয়াই যশস্বিনী হইয়াছেন; "আলো ও ছায়া"র ভাবের গাম্ভীর্য্যে, ভাষার মাধুর্য্যে, ছন্দের মিষ্টতায় পাঠকেরা মন্ত্রমুগ্ধ। অথচ গ্রন্থকর্ত্রী এই "গুঞ্জন" গ্রন্থে তাঁহার নাম প্রকাশ করেন নাই; "জনৈক জননী রচিত"—পুস্তকের উপর কেবল মাত্র এই কয়েকটি কথা লিখিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, "জনৈক জননী"ই যেন গ্রন্থকর্ত্রীর যথার্থ পরিচয়। কারণ গুঞ্জনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতাগুলির মধ্যে কেবল যে তাঁহার কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা নহে, তাঁহার মাতৃত্বেরও পরিচয় পাওয়া যায়; তিনি যে শুধুই কল্পনার আবেগে এই কবিতাগুলি রচনা করিয়াছেন, তাহা নহে; গ্রন্থকর্ত্রী সন্তান বৎসলা জননী, তিনি মাতৃহৃদয়ের স্বাভাবিক বাৎসল্যরসে সিক্ত হইয়া এই কবিতাগুলি রচনা করিয়াছেন। সেই জন্য এই কবিতা সমূহের সর্ব্বত্র কবিত্ব থাকুক আর না থাকুক, কিন্তু প্রত্যেকটি কবিতা মাতৃপ্রাণের স্নেহধারায় সরস ও সুমধুর হইয়া উঠিয়াছে। বালকেরা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া শুধু যে শিক্ষা পাইবে, আমোদ পাইবে, তাহা নয়; তাহারা সুললিত কাব্যরসের সঙ্গে সঙ্গে সুমিষ্ট মাতৃস্নেহের আস্বাদ পাইয়া পুলকিত হইবে, তাহাদের অন্তরে মাতৃভক্তি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে। ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ "গুঞ্জন" হইতে দুএকটি কবিতা উদ্ধৃত করিতেছি :—

"আয়রে ধন, আয়রে বুকে জুড়া আমার প্রাণ,
তোর কাছেতে গুণ্‌গুণিয়ে গাইব আমি গান।
আবোল তাবোল কথায় গাঁথা, দুঃখে ভিজা সুর,
সারা দিনের খেলার শ্রান্তি কর্‌বে তোমার দূর।
তোমার তরে আমার সে গান, শুন্‌বে না আর কেউ
তোমার প্রাণে লাগ্‌বে গিয়ে আমার প্রাণের ঢেউ;
কখন বা হাস্‌বে মৃদু নয়ন মেলি চাবে,
ঘুমের দেশে খেলার মাঝে আমার গান গাবে।
ঘুমের দেশে দেবতারা শিশুর সাথে খেলে,
তোমার মুখে আমার এ গান তাদের কানে গেলে,
শিখিয়ে দিবে নূতন গান নূতন তর সুর
তাই শুনিয়ে সকল দুঃখ কর্‌বে আমার দূর।

অন্যত্র :—

"হাতীর পিঠে হাওদা ঘোড়ার পিঠে জিন,
বন্দুক হাতে, পাগড়ী মাথে প্যাদা রামদীন।
দাদা যাবেন শিকারে ছোট্ট খোকা ভাই
মাকে এসে বল্‌ছেন "আমি, ভালুক মার্‌তে যাই।"
মা বলছেন "বনের ভালুক থাক্ না কেন বনে ?
মায়ের ছেলে মায়ের কোলে খেলুক আপন মনে।'॥

এই সুন্দর কবিতা দুইটি পড়িতে পড়িতে বালক বলিকাদিগের মনে যেমন একটি করুণ ও মধুর ভাব জাগিয়া উঠিবে, তাহাদের সুকুমার হৃদয়ের সম্মুখে যেমন একটি সহজ সৌন্দর্য্য প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিবে, তেমনি তাহাদের কোমল অন্তঃকরণ মাতৃহৃদয়ের একটি মধুমাখা স্পর্শ অনুভব করিবে। তাছাড়া আর একটি কথা; এদেশের যে সকল শক্তিশালী লেখক বালক বালিকাগণের জন্য কবিতা রচনা করেন, তাঁহারাও শুধু কবিতার ছন্দ ও ভাষা যাহাতে মিষ্ট হয়, এবং কবিতা পড়িয়া ছেলেরা যাহাতে আমোদ ও শিক্ষা পায়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখেন। কিন্তু যাহাতে বালকবালিকাদিগের প্রকৃত সৌন্দর্য্য গ্রহণের শক্তি বিকশিত হয়,

কল্পনাশক্তি উন্মেষিত হয়, যথার্থ সাহিত্য-রসের স্বাদ তাহারা গ্রহণ করিতে পারে, সেদিকে তাঁহাদের দৃষ্টি পড়ে না। অথচ ইহাই কাব্যের উদ্দেশ্য। অনেকে হয়ত মনে করিবেন "পাঠকদিগের সৌন্দর্য্য গ্রহণের শক্তিকে ফুটাইয়া তোলা, পুষ্পকোরক সদৃশ অস্ফুট ভাব রাশিকে বিকশিত করা, এবং কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করা কাব্যের উদ্দেশ্য বটে; কিন্তু সেরূপ উচ্চ উদ্দেশ্য লইয়া কি শিশুদের জন্য ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তক রচনা করা যায়? আমরা বলি, যায়। নচেৎ শুধুই শিক্ষা এবং আমোদের জন্য সরল গদ্যেও ত শিশুপাঠ্য গ্রন্থ রচিত হইতে পারে, ছন্দ মিলাইয়া পদ্য রচনার আর প্রয়োজন কি?

একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে, শিশুদিগের উপযোগী কাব্যরসের উদ্দীপনা করাই শিশুপাঠ্য কবিতা পুস্তকের উদ্দেশ্য। আমরা "গুঞ্জনের" অনেকগুলি কবিতায় বালকদিগের উপযোগী এই কাব্যরসের আস্বাদন পাইয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। 'গুঞ্জনের' অনেকগুলি কবিতা আমাদের এতই ভাল লাগিয়াছে যে, সেই কবিতাগুলির মধ্যে কোন্‌টি ছাড়িয়া কোন্‌টি উদ্ধৃত করিব, ঠিক, বুঝিতে পারি না।

"পুঁটিমণির রাজ্য" একটি অতি সুন্দর কবিতা। আমরা উদ্ধৃত করিতেছিঃ—

"আমি যদি হতেম হাল্‌কা প্রজাপতির মত,
ফুলে ফুলে উড়ে উড়ে মধু খেতাম কত;
আমার যদি থাক্‌ত পাখা, চিলের যেমন আছে,
খাবার নিয়ে বসতাম গিয়ে সবার বড় গাছে;
আমার যদি মাছের মত থাক্‌ত লেজ ডানা;
সারাদিন সাঁতার দিতাম, শুনতাম নাকো মানা।
প্রজাপতি সকল ফুলের মনের কথা জানে,
পাখিগুলি কত রাজ্যের কত খবর আনে,
জলের মধ্যে কি তামাসা হচ্ছে নিশিদিন
ডানা নেড়ে গোল চোখে দেখ্‌ছে যত মীন।
আকাশ জুড়ে পাখীর রাজ্য, মাছের রাজ্য জল,
পুঁটু মণির মহারাজ্য মায়ের বক্ষঃস্থল।"

এই শ্রেণীর কবিতার মধ্যে সেকালের মেয়েলী ছড়ার উদাস রাগিণীটুকুর অভাস পাওয়া যায়; অথচ বালকদিগের পক্ষে এই সকল কবিতার তাৎপর্য্য গ্রহণ করাও কঠিন নহে। উপকথা শুনিতে শুনিতে ছেলেদের মন যেমন বিচিত্র কল্পনায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, তেমনি এই সুন্দর কবিতাগুলি পড়িতে পড়িতে ছেলেদের চিত্ত সৌন্দর্য্যে ও কল্পনায় পূর্ণ হইয়া উঠিবে। এ স্থলে আরো একটি কবিতা উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। আমরা "আলো ও ছায়া"র গ্রন্থকর্ত্রীর যে মিঠা হাতের পরিচয় পাইয়াছি, সেই মিঠা হাত ছেলেদের কবিতায় আরও কত মিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, দেখাইতেছি:—

"খুকু মিঠা হাসে, মিঠা ভাষে, মিঠা চোখে চায়,
মিঠা কাঁদে, মিঠা ছাঁদে ঘুমের গান গায়।
মনের মানে অধর কাঁপে,
নরম হাতে মুখটি ঝাঁপে,
মিঠা রাগে কোল্‌ থেকে সে একটু নেমে যায়;
আয় মা, বলে ডাকলে পরে
গলাটি এসে জড়িয়ে ধরে,
বুকে নরম মুখটি রেখে মধুরে ঘুমায়।
আমি জগৎ খুঁজে নাম না পেয়ে, মিঠা বলি তায়।"

এরূপ কবিতা পড়িতে আমাদেরই লোভ জন্মে, ছেলেদের ত কথাই নাই! "গুঞ্জনের" অধিকাংশ কবিতাই যে কেবল উৎকৃষ্ট, তাহা নয় "গুঞ্জনের" ছাপা ভাল, কাগজ ভাল, ছবিগুলি ত খুবই ভাল। তবে দাম কিছু বেশী—ইহাই আমাদের দুঃখ। ইচ্ছা থাকিলেও আমরা সকলে এ বই কিনিয়া ছেলেদের হাতে দিতে পারিব না।

বর্ত্তমান সময়ে ছেলেদের স্কুলপাঠ্য অধিকাংশ গ্রন্থই চালভাজার ন্যায় শুষ্ক, নীরস; পেড্‌লার সাহেবের আদেশে এবং স্কুল মাষ্টারের তাড়নায় ইহা চর্ব্বণ করিলে ছেলেদের যতটা বদহজমের ভয় আছে, ততটা উপকারের আশা নাই। কিন্তু "গুঞ্জনের" গ্রন্থকর্ত্রী "জনৈক জননীর" ন্যায় যদি এদেশের শিক্ষিতা জননীগণ ছেলেমেয়েদের মনোরম পোষাক পরিচ্ছদ অপেক্ষা তাহাদের সুশিক্ষার প্রতি অধিক দৃষ্টি রাখেন; এবং তাহাদের উপযোগী উৎকৃষ্ট শিশুপাঠ্য গ্রন্থ রচনায় মনোযোগিনী হন, তাহা হইলে দেশের ও সাহিত্যের যথেষ্ট উপকার হইতে পারে।

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত।

BENGAL LIBRARY
23 NOV 1906
24

BENGAL LIBRARY
23 JAN 1906

ভারত-মহিলা

B/4 552
32
18/1906

The woman's cause is man's ; they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free ;
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall men grow ?

Tennyson.

১ম ভাগ । আশ্বিন, ১৩১২ । ২য় সংখ্যা ।

মরা গাঙে বাণ এসেছে ।

('মন মাঝি সামাল সামাল'—সুর)

এবার তোর মরা গাঙে বাণ এসেছে
জয় মা বলে ভাসা তরী ।

ওরে রে ও মাঝি, কোথায় মাঝি,
প্রাণপণে ভাই ডাক দে আজি, (তোরা সবাই মিলে)
তোরা সবাই মিলে বৈঠা নে রে, খুলে দে সব দড়াদড়ি ।

দিনে দিনে বাড়্‌ল দেনা,
ও ভাই কর্‌লিনে কেউ বেচা কেনা
হাতে নাই রে কড়াকড়ি ।

ও তোর ঘাটে বাঁধা দিন গেল রে
মুখ দেখাবি কেমন ক'রে
ওরে দে খুলে দে
ওরে খুলে দে পাল তুলে দে
যা হয় হবে বাঁচি মরি ।

বঙ্গের জাতীয় উৎসব ।

শারদীয় পূজা বাঙ্গালীর জাতীয় উৎসব। যাঁহারা নিজগৃহে দুর্গাপ্রতিমা নির্ম্মাণপূর্ব্বক পূজার্চ্চনা করেন, তাঁহাদের ত কথাই নাই, যে সকল হিন্দু পূজা করিতে অসমর্থ তাহাদের গৃহেও এই সময় আনন্দের হিল্লোল প্রবাহিত হয়। অহিন্দু মুসলমান ও খ্রীষ্টানগণ পর্য্যন্ত এই সময়ে প্রতিবাসী হিন্দুভ্রাতার আনন্দোৎসবের অংশভাগী হয়েন। ভারতের অন্য কোন প্রদেশে সমাজের সর্ব্বস্তরব্যাপী এমন আনন্দময় ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রচলিত নাই। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কোন কোন স্থানে 'গণগৌরী' অর্থাৎ গণেশক্রোড়া গৌরীমূর্ত্তির পূজা প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু বঙ্গদেশ-প্রচলিত দুর্গোৎসবের সহিত তাহার কোনরূপ তুলনা হয়না। কি কারণে বঙ্গদেশে এই দুর্গোৎসব এতদূর প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে, বাঙ্গালী চরিত্রের কোন্ বিশেষত্বকে আশ্রয় করিয়া ইহা এদেশে আপনার মূল এমন দৃঢ় ভাবে প্রোথিত করিয়াছে, তাহা গভীর চিন্তার বিষয়। এস্থলে সে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব

না। কোন্ সময়ে দুর্গোৎসব প্রচলিত হইয়াছে তাহাও নির্ণয় করা সহজ নহে। এদেশে একটা সংস্কার আছে, দশরথ তনয় রাম কর্ত্তৃক দুর্গাপূজা প্রথম প্রচলিত হয়, কিন্তু বাল্মিকী রামায়ণে একথার কোন উল্লেখ নাই। রাবণবধে সাহায্য লাভের জন্য রণশ্রান্ত রাম যে দেবস্তুতি করিয়াছিলেন, একটু প্রণিধান করিলেই দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সূর্য্যরূপী ঐশীশক্তির স্তুতি, দশভুজা দুর্গারাধনা নহে। রামায়ণ অথবা মহাভারতে মূর্ত্তিপূজার কোন উল্লেখ নাই। এই মহাকাব্যদ্বয় রচনার বহুকাল পরে ভারতে মূর্ত্তিপূজা প্রচলিত হইয়াছে। কালিকা-পুরাণ ও মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডী হইতেই দুর্গোৎসবের মূল আকর্ষণ করা হইয়াছে। চণ্ডীতেও মূর্ত্তিপূজার কোন ব্যবস্থা নাই। অনুধাবন করিয়া দেখিলে সহজেই উপলব্ধি হয়, চণ্ডীতে শক্তিমূর্ত্তির আবির্ভাবের যে মনোরম বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে তাহা ঐশীশক্তির রূপক বর্ণনা মাত্র। মানুষ চিরকালই শক্তির সঙ্গে সঙ্গে শক্তিমান্‌কে জড়িত করিয়াছে। শক্তির আধারভূত ব্যক্তিকে বাদ দিয়া শুধু শক্তি-কল্পনা দ্বারা মানব হৃদয় তৃপ্ত হয়না। আর শক্তির পশ্চাতে ব্যক্তিকে দেখিতে গেলেই ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ মানুষ অনন্ত শক্তিধর দেবতাকে আপনার অসম্পূর্ণ ভাবে ও ভাষায় সসীমরূপে কল্পনা ও বর্ণনা করে। চণ্ডী-বর্ণিত দেবী আবির্ভাবের আখ্যায়িকাটী এই :—পুরাকালে সুরথ নামক নরপতি শত্রুকর্ত্তৃক পরাজিত ও অপহৃতা-ধিপত্য হইয়া মেধস নামক মুনির তপোবনে গমন করেন, সমাধি নামক এক বৈশ্য জাতীয় ব্যক্তিও অসাধুবৃত্ত ধনলুব্ধ পুত্রকলত্রাদি দ্বারা অপহৃতধন ও বিতাড়িত হইয়া সেই মুনির আশ্রমে উপনীত হয়েন। উভয়ে তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইলে মুনি ঐশী মায়ার উৎপত্তি ও স্বরূপ বর্ণন করিতেছেন,—"তিনি নিত্যা, জগন্মূর্ত্তি, অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার স্বরূপ, তাঁহাদ্বারা এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে, যদি ও আমাদের ন্যায় তাঁহার জন্ম মরণ কিছুই নাই তথাপি লোকে তাঁহার উৎপত্ত্যাদি কীর্ত্তন করে, আমার নিকট তাহা বহু প্রকারে শ্রবণ কর। স্মরণার্থে পুনরপি বলিতেছি, তিনি নিত্য বস্তু, কিন্তু দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত যখন আবির্ভূতা হয়েন তখনই তাঁহাকে উৎপন্না বলিয়া থাকে।" দেবীমাহাত্ম্য, মধুকৈটভবধ অধ্যায়, ৫৬—৫৮ শ্লোক।

এতদপেক্ষা স্পষ্টতর ভাষায় কাল্পনিকতার স্বীকারোক্তি আর কিছুই হইতে পারে না। তৎপর মহিষাসুর সৈন্যবধ অধ্যায়ে এই দেবীর কল্পিত আবির্ভাব সম্বন্ধে উক্ত হইতেছে,—"অনন্তর অতিক্রোধ পরিপূর্ণ বিষ্ণু, ব্রহ্মা এবং শঙ্করের বদনমণ্ডল হইতে মহৎ তেজ নির্গত হইতে লাগিল। তখন ইন্দ্রাদি অন্যদেবগণের শরীর হইতেও অতীব তেজ বিনির্গত হইয়া মিলিত হইল। ঐ তেজোরাশি দিঙ্মণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিলে দেবগণ উহা জলন্ত পর্ব্বতের ন্যায় দেখিতে পাইলেন। অনন্তর তথায় সমস্ত দেবদেহ-সম্ভূত সেই নিরুপম তেজোরাশি মিলিত হইয়া নারীরূপে পরিণত হইল। তাহার কান্তি দ্বারা ত্রিলোক পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। শম্ভুতেজ দ্বারা সেই নারীদেহের মুখমণ্ডল বিকাশিত হইল, যম ও বিষ্ণুর তেজ দ্বারা কেশ ও বাহু উৎপন্ন হইল, ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ এবং পৃথিবীর তেজ দ্বারা যথাক্রমে মধ্যভাগ, স্তন, জঙ্ঘা, উরুদেশ এবং নিতম্ব নির্ম্মিত হইল। ব্রহ্মা, সূর্য্য, অষ্টবসু এবং কুবেরের তেজ দ্বারা যথাক্রমে চরণদ্বয়, পদাঙ্গুলি, হস্তাঙ্গুলি এবং নাসিকা উৎপন্ন হইল। প্রজাপতির তেজদ্বারা দন্ত, আগ্নেয় তেজ দ্বারা নয়ন, সন্ধ্যার তেজে ভ্রূদ্বয়, বায়ুর তেজে কর্ণদ্বয় এবং অন্যান্য দেবগণের তেজঃপুঞ্জ হইতে শিবার অন্যান্য অবয়ব সৃষ্ট হইল।" এই আবির্ভূতা দেবী দেবগণের আরাধনায় তুষ্ট হইয়া দেবদ্বেষী অসুরের সহিত মহা সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন ও মধুকৈটভ, মহিষাসুর, রক্তবীজ প্রভৃতি দুর্দ্দান্ত দানবকুলকে সংহার করিলেন। এই সকল বর্ণনা পাঠ করিতে করিতে সহজেই উপলব্ধি হয় যে, ঐশী শক্তির সকল কোমলতা, সকল সৌন্দর্য্য ও তেজস্বিতা একত্র সংগ্রহ করিয়া কবিকল্পনা একটী মনোরম দেবীমূর্ত্তি গঠন করিয়াছে। স্বয়ং কবি যৎপরোনাস্তি স্পষ্ট ভাষায় পাঠককে বলিয়া দিয়াছেন ইহা নিরবচ্ছিন্ন কল্পনা মাত্র। যুদ্ধ ব্যাপারটীর মধ্যে একটী অতি সুন্দর তত্ত্ব নিহিত আছে। পাপপ্রবৃত্তির সঙ্গে মানবাত্মার

সংগ্রাম অনিবার্য্য। ঐশী শক্তির সাহায্য ব্যতিরেকে মানুষ কিছুতেই এই সংগ্রামে জয়ী হইতে পারে না। একটী পাপ বিনষ্ট কর, অন্য পাপকামনা মনে জাগ্রত হইবে। যতক্ষণ মনে পাপের মূল বিদ্যমান থাকে ততক্ষণ রক্তবীজের বংশের ন্যায় পাপ প্রবাহের আর বিরাম হয় না। মানুষ নিজে এই পাপের বিনাশ সাধন করিতে পারে না, ঐশী শক্তি, ঐশী করুণার সাহায্যে উহা বিনষ্ট করিতে হয়। চণ্ডীর আদ্যন্ত এই রূপক বর্ণনায় পরিপূর্ণ। শেষ কতিপয় শ্লোকে সুরথ ও সমাধির মৃণ্ময়ী দেবীমূর্ত্তি আরাধনার কথা উল্লিখিত আছে বটে, কিন্তু উহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই বোধ হয়। প্রক্ষিপ্ত হউক আর না হউক, কবির কল্পিত এই সূক্ষ্ম মানসী মূর্ত্তিই যে এখন বঙ্গ গৃহে জড়, স্থূল, মৃণ্ময়ী, ত্রিনয়না, দশভূজা মূর্ত্তিতে পূজা প্রাপ্ত হয়েন সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। শুধু দুর্গামূর্ত্তির কথাই বা বলি কেন, হিন্দুর দেবমূর্ত্তি মাত্রই ঐশী শক্তির কল্পিত বাহ্য চিত্র। শুধু ভারতে নয়, প্রচীন গ্রীস, রোম প্রভৃতি দেশেও এই প্রকার। জ্ঞানের শাণিত ছুরিকাঘাতে এই সকল জড় মূর্ত্তিকে ব্যবচ্ছেদ কর, তৃণ, মৃত্তিকা, প্রস্তরাদি ব্যতীত আর কিছুই পাইবে না। কিন্তু যুগে যুগে, দেশে দেশে এই সকল স্বরূপকল্পনা কোটী কোটী নরনারীর হৃদয়ের ভাবরাশিকে চরিতার্থ করিয়া আসিয়াছে। ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য স্রোতস্বতী যেমন শত প্রণালী প্রবাহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবাহ দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া প্রবল তরঙ্গিণীর আকারে পৃথিবীকে সুজলা ও সুফলা করে, মানব হৃদয়প্রবাহিত স্বর্গীয় প্রেম-স্রোতস্বিনীও তেমনি এই সকল কল্পিত দেব-দেবীর আরাধনা দ্বারা পরিপুষ্টাঙ্গ হইয়া অপত্য স্নেহ, দাম্পত্য প্রেম প্রভৃতি আকারে জগৎকে মিষ্ট ও বাসযোগ্য করিতেছে। একবার চিন্তা করিয়া দেখ দুর্গোৎসব এই বঙ্গদেশের শিল্প, জ্ঞান ও ভাবরাজ্যে কি অদ্ভুত শক্তি বিস্তার করিয়াছে। এই দুর্গাপ্রতিমা গঠনের জন্য শিল্পীকে, প্রতিমা সজ্জিত করিবার জন্য সজ্জা প্রস্তুতকারী স্বর্ণকারাদিকে শিল্প চর্চ্চায় কত উৎসাহিত করে। দুর্গোৎসবে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ধনীদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য শ্লোক প্রণয়নে, ভট্টগণ সুমধুর কবিতা রচনাপ্রয়াসে কত মস্তিষ্ক-পরিচালনা করেন, আর সমস্ত বঙ্গদেশে যে গভীর ভাবের উৎস উৎসারিত হয় অন্যত্র কোথাও তাহার তুলনা সম্ভব কিনা অবগত নহি। এই সময়ে জাতিভেদের বন্ধন শিথিল হইয়া যায়। জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে ধনশালী হিন্দুগণ প্রার্থীদিগকে অর্থ দানে তুষ্ট ও আহারাদি দানে আপ্যায়িত করেন। প্রবাসস্থিত পতিপুত্রের জন্য নারীহৃদয়ে, গৃহবাসিনী মাতা ভগ্নী, স্ত্রী কন্যার জন্য পুরুষহৃদয়ে, পরস্পর বিচ্ছিন্ন বন্ধুর জন্য বন্ধুহৃদয়ে এই সময়ে ভাবস্রোত যেরূপ উচ্ছ্বসিত হয়, শত্রুমিত্রে যে আলিঙ্গনের কোলাহল পড়িয়া যায় তাহাতে সত্যই কি বঙ্গদেশের পাপরাশির বহুস্তর বিধৌত হইয়া যায় না? কিন্তু গভীর চিন্তার বিষয় এই যে, বর্ত্তমান যুগের জ্ঞান বিজ্ঞানের সম্মুখে বঙ্গের দুর্গোৎসব ক্রমেই শক্তিহীন হইয়া পড়িতেছে, ইহার শক্তি ও প্রেমসঞ্চারিণী প্রভাব ক্রমেই অন্তর্হিত হইতেছে। সত্যের সঙ্গে মিশ্রিত কল্পনাটুকু যদি খসিয়া যায় তাহাতে লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই। কিন্তু সেই সঙ্গে সত্যটুকুও যদি অদৃশ্য হইয়া পড়ে তবে ক্ষতির পরিসীমা নাই। রূপক কল্পনা পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গালীর হৃদয় যদি এখন নিরবচ্ছিন্ন সত্যের পশ্চাতেই ধাবিত হয় তবে দুর্গোৎসবের এই প্রাণহীনতা ক্ষতির কারণ নহে, সমূহ লাভেরই বিষয়। চণ্ডীবর্ণিত কল্পিত দুর্গামূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া বঙ্গবাসী যদি অন্তরে ঐশী শক্তির কোমলতা, সৌন্দর্য্য ও তেজস্বিতা ধ্যান করে, নিরীহ, নিরপরাধ পশুবলির নিষ্ঠুরতা ত্যাগ করিয়া কাম ক্রোধাদি রিপুকুলকে সেই শক্তির নিকটে বলিদান করে, ঘোর রিপুসংগ্রামে যদি দৈব বলের সাহায্য-প্রার্থী হয়, তবে পতিত বাঙ্গালী জাতি প্রকৃত শক্তিপূজা করিয়া নিশ্চয়ই জীবন্ত ও শক্তিশালী হইয়া উঠিবে। তাই অন্তরের সহিত প্রার্থনা করি, বঙ্গে প্রকৃত শক্তিপূজা প্রতিষ্ঠিত হউক। বিংশ শতাব্দীর জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত নরনারী সরল বিশ্বাসে দুর্গোৎসব করিবে সে ৮।০।

বৃথা। প্রবহমানা স্রোতস্বতীকে উৎপত্তি স্থানে প্রত্যানয়নের ন্যায় জ্ঞান বিজ্ঞানের উত্তরোত্তর বর্দ্ধনশীল বেগ প্রতিহত করা নিতান্তই অসম্ভব ও অযৌক্তিক। কিন্তু বাঙ্গালীর ধর্ম্মজীবনে,—অতএব সমগ্র জাতীয় জীবনে দুর্গোৎসব যে সমুচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে তাহার সুফলের প্রতি উদাসীন হওয়া কর্ত্তব্য নহে। খ্রীষ্টধর্ম্মের ইতিহাস পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে যে "হিদেন" প্রদেশে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রবেশ করিয়াছে খ্রীষ্টানগণ প্রচলিত পৌত্তলিকতাংশ বর্জ্জন করিয়া তাহারই পূজা পার্ব্বনগুলি স্বীয় ধর্ম্মানুষ্ঠানের অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছে। দুর্গোৎসবের যে অংশ তাঁহাদের জ্ঞান বিশ্বাসের অনুমোদিত নহে তাহা বর্জ্জন করিয়া শিক্ষিত নরনারী যদি এই জাতীয় উৎসবের সুপ্রতিষ্ঠিত গুরুত্বের সাহায্য গ্রহণ করতঃ জাতীয় উন্নতি সাধনে মনোযোগী হয়েন তদ্দ্বারা সুমহৎ ফল উৎপন্ন হইতে পারে। সম্প্রতি বঙ্গব্যবচ্ছেদ ব্যাপার উপলক্ষে সমগ্র বঙ্গদেশ ঘোর আন্দোলিত। এই আনন্দোৎসবের সময়েও বঙ্গের গৃহে গৃহে গভীর বিষাদের কালিমা পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। দেশের শুভদিনে দুর্গোৎসব জাতীয় শিল্প, বিদ্যা ও প্রেমের পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছে, বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে সমগ্র বাঙ্গালী জাতি যদি ঐশী শক্তির সাহায্যপ্রার্থী হইয়া এই চিরাগত ভাবস্রোতকে জাতীয় উন্নতি সাধনে পরিচালিত করেন, এই সময়ে স্থানে স্থানে বিদ্বন্মণ্ডলী সমবেত হইয়া যদি কাব্য দর্শনাদির আলোচনা করেন, দেশের কুশলী কুম্ভকার, স্বর্ণকার, তন্তুবায় প্রভৃতি শিল্পীগণের কারুকার্য্যাদি সংগ্রহ পূর্ব্বক পুরস্কারাদি দ্বারা যদি সাধারণ জনমণ্ডলীর চিত্ত এই সকল বিষয়ে আকৃষ্ট করা হয়, মাতৃভূমির উন্নতিসাধক বিবিধ বিষয়ের আলোচনা হয় এবং যদি হিন্দুতে হিন্দুতে, মুশলমানে মুশলমানে এবং হিন্দুমুশলমানে জন্মভূমির প্রেমে মিলিত হইয়া পরস্পরকে ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করে তবে দেশে নব শক্তির সঞ্চার হইতে পারে।

বৈদিক সমাজ-চিত্র।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রথম অধ্যায়ের শেষভাগে যে ঘটনা বিবৃত হইয়াছে, তাহাতে মিত্রমুনির মনস্কামনা সিদ্ধি বিষয়ে সাক্ষাৎভাবে কোন সাহায্য হয় নাই। তিনি যদি নীচমনা লোক হইতেন, তবে যাজ্ঞবল্ক্যের প্রাণরক্ষার পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে নিজ মনস্কামনা-সিদ্ধির প্রার্থনা জানাইতে পারিতেন। সে কালের সাধারণ সামাজিক অবস্থা যেরূপ ছিল, তাহাতে এরূপ অনুকূল ঘটনা ঘটিলে পাত্র পরিণীত হইলেও তাঁহাকে রূপগুণবতী কন্যাদান-প্রস্তাব অসঙ্গত বোধ হইত না এবং অনুরুদ্ধ পাত্রও সাধারণতঃ এরূপ প্রস্তাবে সন্তুষ্ট বই অসন্তুষ্ট হইতেন না। কিন্তু পাঠক প্রথম অধ্যায় পড়িয়াই বুঝিয়া থাকিবেন যে, মিত্রমুনি ও যাজ্ঞবল্ক্য উভয়েই অসাধারণ লোক ছিলেন। সুতরাং যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রেয়ীর মিলন সহজে সাধিত হয় নাই। যাহা হউক উক্ত ঘটনার সাক্ষাৎ ফল এই হইল যে, মুনিদ্বয়ের প্রীতিবন্ধন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক দৃঢ়তর হইল। উভয়ের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উভয়ের পরিবারবর্গের মধ্যে দেখা শুনা ও পরস্পরের বাড়ীতে যাতায়াত পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইল। এই যাতায়াত ও দেখা শুনার একটি বিশেষ ফল এই দাঁড়াইল যে, কাত্যায়নী ও মৈত্রেয়ীতে গাঢ় বন্ধুতা স্থাপিত হইল। উভয়ের প্রকৃতি অনেকাংশে পরস্পরের বিপরীত; কিন্তু এই বৈপরীত্যই তাঁহাদের বন্ধুতার কারণ হইল। যাঁহাতে যাহা নাই, তাহা অন্যের চরিত্রে দেখিয়া একে অন্যের প্রতি আকৃষ্টা ও আসক্তা হইতে লাগিলেন। কাত্যায়নী সহজেই প্রেম-প্রবণা, ভালবাসার পাত্র দেখিলে সহজেই তা'র প্রতি হৃদয় ধাবিত হয়; ভাব-প্রবণা,—প্রিয় ব্যক্তি বা প্রিয় বস্তু দেখিলে তৎক্ষণাৎ মুখ হাস্যময় হয়; অপ্রিয় দর্শনে বা অপ্রিয় শ্রবণে সহসাই চক্ষুদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হয়। মন কিছু চঞ্চল ও লঘু,—আমোদ প্রমোদ ও গল্প শুনায় অনেক সময় কাটাইতে পারেন, কিন্তু অধ্যাত্ম-তত্ত্বাদি গভীর বিষয়ে অনেকক্ষণ মনোনিবেশ করিতে পারেন না।

কিন্তু তাঁহাতে কর্ত্তব্যনিষ্ঠার অভাব নাই। গভীর পতি-ভক্তি ও সন্তানবাৎসল্য বশতঃ তিনি প্রায় সমস্ত দিনই গৃহকার্য্যে ব্যস্ত থাকেন; পারিপাট্য ও সুখ স্বচ্ছন্দতা সম্বন্ধে তাঁহার গৃহ সকলের আদর্শস্থানীয়। মৈত্রেয়ীর চরিত্র ইহার প্রায় বিপরীত। তাঁহার যে ভালবাসা নাই তাহা নহে, কিন্তু তাঁহার ভালবাসার পাত্র ২।৪টী বাছা বাছা লোক মাত্র। তাঁহার চিত্তের গতি অন্তর্ম্মুখিনী, সুতরাং বাহিরের প্রিয় বা অপ্রিয় বস্তু সেই চিত্তে সহজে সুখ দুঃখের তরঙ্গ তুলিতে পারে না; অল্প বয়সেই তাঁহার মুখ প্রশান্ত গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়াছে। তিনি বাহিরের আমোদ প্রমোদ, গল্পসল্প তত ভালবাসেন না, উচ্চ বিষয়ের চিন্তা ও আলোচনাতেই অনেক সময় কাটান। পিত্রালয়ে গৃহকার্য্য যতটুকু বাধ্য হইয়া করিতে হয়, কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে করেন, তাহাতে বিশেষ আসক্তি নাই। যাহা হউক, এই বিপরীতপ্রকৃতি নারীদ্বয়ের মধ্যে অতি অল্পদিন মধ্যেই গাঢ় প্রীতি-সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। বিশেষতঃ কাত্যায়নী মৈত্রেয়ীর প্রতি অত্যন্ত আসক্তা হইলেন; মৈত্রেয়ীর সহিত মিলন ও বিচ্ছেদ তাঁহার জীবনের সুখদুঃখের একটা বিশেষ কারণ হইয়া উঠিল। এক দিন দু-জনে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইল:—

কাত্যায়নী।—আমি ভাবি তোমার বিবাহ হইলে আমার গতি কি হইবে? এক একটী ভগিনীর বিবাহ হইয়াছে, আর কাঁদিয়া কাঁদিয়া আকুল হইয়াছি। যাহা হউক তাহাদের বিচ্ছেদ অনেকটা সহ্য হইয়া গিয়াছে, তোমাকে হারাইলে বাঁচিব কি না সন্দেহ হয়।

মৈত্রেয়ী।—সে ভাবনার দরকার নাই, তোমায় আমায় কখনও ছাড়াছাড়ি হইবে না।

কাত্যায়নী।—তার অর্থ কি? বাড়ীর কাছে তোমার বিবাহ হইলে তোমাকে সর্ব্বদা দেখিতে পাইব বটে, কিন্তু কাছেই যে বিবাহ হইবে, তার আশা কোথায়?

মৈত্রেয়ী।—বিবাহ হইবেই যে তা'র অর্থ কি?

কাত্যায়নী।—তোমার আবার বিবাহ হইবে না! তোমার প্রার্থী অনেক জুটিবে।

মৈত্রেয়ী।—আমি যদি কা'রও প্রার্থনা পূর্ণ না করি?

কাত্যায়নী।—কেন, তোমার ব্রহ্মচারিণী হইবার ইচ্ছা না কি? আমি ভাই তা পসন্দ করি না। আমার বোধ হয় গার্হস্থ জীবনই স্ত্রীলোকের প্রশস্ত কার্য্যক্ষেত্র।

মৈত্রেয়ী। গার্হস্থ জীবন কেবল স্ত্রীলোকের নয়, পুরুষেরও কার্য্যক্ষেত্র। কিন্তু ইহাকে বিশেষভাবে স্ত্রীজাতির কার্য্যক্ষেত্র বলিয়া বর্ণনা করিলে, ইহাতে এই বুঝায় যে তাহাদের যেন গার্হস্থ কার্য্য ছাড়া আর কোন কার্য্য নাই।

কাত্যায়নী।—আর কি কার্য্য? ধর্ম্মকার্য্য?—সে ত গৃহকার্য্যের মধ্যেই গণ্য। যজ্ঞ, ব্রত, উপবাস, দেবস্তুতি, এই সকল ত প্রত্যেক গৃহিণীকেই করিতে হয়।

মৈত্রেয়ী।—যজ্ঞাদি ধর্ম্মানুষ্ঠানের অতীত কি আর কোন কার্য্য নাই? আত্মজ্ঞান লাভ কি জীবনের একটা বিশেষ কার্য্য নহে?

কাত্যায়নী।—তাহা বিদ্বান্‌দিগের কার্য্য বটে। কিন্তু বিদ্যাবতী স্ত্রীলোক কয়টী আছে? তোমার মাসীর ন্যায় যে সকল মেয়ের যথেষ্ট সময় ও শক্তি আছে, তাঁহারাই আত্মজ্ঞান লাভে যত্ন করিতে পারেন। ইহা প্রধানতঃ পুরুষেরই কাজ।

মৈত্রেয়ী।—আত্মা কি কেবল পুরুষেই আছেন, স্ত্রীতে নাই?

কাত্যায়নী।—(সহাস্যে) স্ত্রীতেও আছেন বই কি? না থাকিলে আমরা দেখিতেছি, শুনিতেছি, জানিতেছি, কিরূপে?

মৈত্রেয়ী।—স্ত্রী পুরুষে সমানভাবে আছেন? পুরুষে অধিক, আর স্ত্রীতে অল্প এরূপ নয়?

কাত্যায়নী।—(সহাস্যে) না, সমানভাবেই আছেন। এই বিষয়ে স্ত্রী-পুরুষে কোন প্রভেদ নাই।

মৈত্রেয়ী।—আর আত্মাকে না জানিলে মুক্তি নাই, তাহাও জান? যাজ্ঞবল্ক্য মুনির পত্নীকে এই কথা আমায় শিখাইতে হইবে না।

কাত্যায়নী।—হাঁ, তাহাও শুনিয়াছি।

মৈত্রেয়ী।—আর মুক্তি স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই লভনীয়, তাহাও নিশ্চিত?

কাত্যায়নী।—হাঁ তা'তে আর সন্দেহ কি ?

মৈত্রেয়ী।—তবে স্ত্রীজাতি মুক্তি সাধনে এত শিথিলযত্ন কেন? আর আত্মজ্ঞান লাভকে প্রধানতঃ পুরুষেরই কার্য্য বলিয়া মনে করা হয় কেন? গার্হস্থ কার্য্য স্ত্রীলোকের করণীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু পুরুষেরা অর্থোপার্জ্জনাদি সাংসারিক কার্য্য করিয়াও মুক্তিসাধনরূপ মহৎকার্য্য বিস্মৃত হন না। স্ত্রীলোকেরা গৃহকার্য্য করিয়াই মনে করেন তাঁহাদের সমস্ত কর্ত্তব্য করা হইল। এমন ভয়ানক আত্মবিস্মৃতি আর কি আছে?

কাত্যায়নী।—ঠিক বলেছ, ভাই। তোমার কথায় আমার চক্ষু খুলিল। স্ত্রী ও পুরুষের শারীরিক ও মানসিক প্রভেদ বশতঃ তাহাদের কার্য্যক্ষেত্র কিছু ভিন্ন ভিন্ন; কিন্তু আত্মা সম্বন্ধে তাহারা সমান, উভয়ের মধ্যে আত্মা সমভাবে বর্ত্তমান, সুতরাং আত্মজ্ঞানলাভ ও মুক্তিলাভে যত্ন, উভয়েরই সমান কর্ত্তব্য—এই কথাটি তোমার কথায় আমি আজ স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিলাম। মুনির কাছে কতদিন এই সকল কথা শুনিয়াছি, কিন্তু ভাল বুঝিতে পারি নাই, তোমার কথায় আমার চক্ষু খুলিল। আমি এখন বুঝিতে পারিতেছি যে মেয়েরা যে উচ্চজ্ঞানলাভে যত্ন করেন না, সে তাঁহাদের নিজেদের দোষ। আমি ত নিতান্ত অপরাধিনী। আমি এমন সুবিধা পাইয়াও কিছুই করিতেছি না।

মৈত্রেয়ী—তোমার মহা সৌভাগ্য। বহু জন্মের পুণ্যফলে এমন পতিরত্ন লাভ করিয়াছ। আমি ভাবি মেয়েরা স্বয়ম্বরের অধিকারিণী হইয়াও বাছিয়া বাছিয়া কেবল ধনী ও বিলাসী যুবকদিগকে বরণ করে কেন? তোমার স্বামীর ন্যায় জ্ঞানী, যোগ-পরায়ণ, মুক্তির সহায়রূপী মহাজনের আশ্রয় লয় না কেন?

এই সময়ে কাত্যায়নী দেবীর ভৃত্য আসিয়া তাঁহাকে জানাইল যে, বেলা প্রায় অবসান হইয়াছে, এখন তাঁহার গৃহে প্রত্যাগমন করা আবশ্যক। তত্ত্ব-কথায় মগ্ন হইয়া গৃহকার্য্য বিস্মৃত হওয়া—কাত্যায়নীর জীবনে এই প্রথম ঘটিল। গৃহকার্য্য স্মরণ হওয়া মাত্র তাঁহার মন চঞ্চল হইল। তিনি অবিলম্বে বন্ধুদিগের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহে গমন করিলেন।

তত্ত্ব-কথার নেশা কাত্যায়নীর অনেকক্ষণ রহিল না। মৈত্রেয়ীর সঙ্গে তাঁহার যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা তাঁহার বার বার স্মরণ হইতে লাগিল বটে, কিন্তু তন্মধ্যস্থ বিচার-ভাগ ক্রমশঃ তাঁহার নিকট অস্পষ্ট হইতে লাগিল, আর যে যে অংশে মৈত্রেয়ীর বিবাহের কথা হইয়াছিল, আর যে স্থলে তিনি স্বয়ম্বরাধিকারের সদ্ব্যবহার ও কাত্যায়নীর 'মহা সৌভাগ্যে'র কথা বলিয়াছিলেন, সেই সকল অংশই তাঁহার বিশেষ ভাবে স্মরণ হইতে লাগিল। তখন, কাত্যায়নীর মনে এই প্রশ্ন উঠিল,—"তবে কি মৈত্রেয়ীর ইচ্ছা আমার পতিরত্নকে পতিত্বে বরণ করে?" সন্দেহ গাঢ় হইবার পূর্ব্বে ভাবিলেন,—"কি অপূর্ব্ব মিলনই হইত! মুনিবর যে বলেন, "পত্নীকে যে ভালবাসা, সে পত্নীকে ভালবাসার জন্য নয়, পরমাত্মাকে ভাল বাসিবার জন্য, পতিকে যে ভালবাসা সে পতিকে ভালবাসার জন্য নয়, পরমাত্মাকে ভাল বাসিবার জন্য,"* এই কথা এরূপ মিলনেই সম্ভব হইত।" কিন্তু যখন নানা ঘটনায় তাঁহার সন্দেহ গাঢ়তর হইল, আর এই "অপূর্ব্ব মিলন" কতকটা সম্ভব বলিয়া বোধ হইল, তখন তাঁহার চিত্তে একটা সংগ্রাম উপস্থিত হইল। আমরা এই সংগ্রাম বর্ণনা করিব না; পাঠক পাঠিকা ইহা কল্পনা করিয়া বুঝুন। সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া তিনি এই জয়ের ফল স্বামীর নিকট যেরূপে প্রকাশ করিলেন, আমরা কেবল সেই বিষয়েই কিছু বলিব।

মৈত্রেয়ীর সংকল্পের বিষয় তিনি ইতিপূর্ব্বেই নিঃসন্দিগ্ধরূপে অবগত হইয়াছিলেন; কিন্তু সহসা স্বামীর কাছে সে বিষয় উত্থাপন করেন নাই; কিন্তু তিনি দেখিতেছিলেন যে, স্বামীর সেই মহা বিপদের দিনের পর হইতে দু'টী লোক, যাঁহাদের সহিত কাত্যায়নীর পরিচয় ছিল না, অনেক সময়ই মুনিবরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। তাঁহারা আর কেহ নহেন, মুনিবরের প্রাণরক্ষক যজ্ঞদত্ত

* বৃহদারণ্যক উপনিষদ্।

ও বিষ্ণুমিত্র। একদিন বিষ্ণুমিত্রের সহিত যাজ্ঞবল্ক্যকে অনেকক্ষণ গোপনে কথাবার্ত্তা কহিতে দেখিয়া কাত্যায়নী মন্ত্রণার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। এই প্রসঙ্গে স্বামীস্ত্রীর মধ্যে যে কথোপকথন হইল আমরা তাহার কিয়দংশমাত্র পাঠকে শুনাইতেছি,—

যাজ্ঞবল্ক্য।—কি আশ্চর্য্য! ইহাতে তোমার আপত্তি নাই?

কাত্যায়নী।—আপত্তি থাকা দূরে থাক্, আমি ত স্পষ্টই বলিতেছি, ইহাতে আমি অত্যন্ত সুখী হইব। না হইলেই দুঃখিত হইব।

যাজ্ঞবল্ক্য।—তাঁহার প্রতি তোমার ঈর্ষা হইবে না?

কাত্যায়নী।—আমার প্রতি তোমার ভালবাসার গভীরতা সম্বন্ধে যদি আমার কোন সন্দেহ থাকিত, তবে ঈর্ষা হইত কি না জানি না। এখন ত হইতেছে না।

যাজ্ঞবল্ক্য।—তোমা অপেক্ষা তাঁহাকে যে আমি অধিক ভাল বাসিব না, তাহা কে বলিল?

কাত্যায়নী।—তাঁ'র প্রতি তোমার মনের ভাব কিরূপ, তাহা ত স্পষ্টই বলিয়াছ।

যাজ্ঞবল্ক্য।—তাহা ত পরে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, গাঢ়তর হইতে পারে।

কাত্যায়নী।—তাহা হইলেও আমি ক্ষতি বোধ করিব না। সে আমা অপেক্ষা অধিক ভালবাসা পাইবার উপযুক্ত। ভালবাসা সম্বন্ধে আমার মনের ভাব ইদানীং আশ্চর্য্যরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তোমার যে ঐ কথাটা —পতি পত্নীর ভালবাসার উদ্দেশ্য পরমাত্ম-প্রীতিসাধন— এই কথাটা বার বার ভাবিয়া আমার বড় উপকার হইয়াছে। যাহা হউক, আমি এই সকল কথা কি বুঝি, আমার মনের ঠিক ভাবটা এই যে তুমি আমা অপেক্ষা আর কাহাকেও কখনও অধিক ভালবাসিতে পারিবে না।

যাজ্ঞবল্ক্য।—(সহাস্যে) তোমার নিজের রূপগুণের উপর বিশ্বাসটা ত কিছু অতিরিক্ত রকমের।

এরূপ কথাবার্ত্তা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে আরও অনেকবার হইল। মুনিবরের বন্ধুবর্গ তাঁহাকে কিরূপ পরামর্শ দিলেন তাহাও সহজেই কল্পনা করা যায়। এই সমুদায় মন্ত্রণা ও পরামর্শে চারি বৎসর অতিবাহিত হইল। সমুদায়ের ফল এই যে, মুনিবরকে দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ করিতে হইল। কাত্যায়নী স্বয়ংই সপত্নী ডাকিয়া আনিলেন। মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্য-মুনির ধর্ম্মপত্নী হইলেন। আমরা চারি সহস্র বৎসরের সভ্যতার আলোক মস্তকে লইয়া যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি সকলকে তিরস্কার করিতে পারি। এখন দ্বি-বিবাহ বা বহু বিবাহকারী বা এরূপ বিবাহের প্রশ্রয় দাতৃগণ নিন্দার পাত্র, সন্দেহ নাই। কিন্তু তখনকার লোকের মনে বর্ত্তমান পারিবারিক আদর্শ প্রকাশিত হয় নাই।

তৃতীয় অধ্যায়।

মৈত্রেয়ীর বিবাহের অব্যবহিত পরেই এক দিন সায়াহ্নে মুনিবর পত্নীদ্বয় সহ 'তপোগৃহে' উপবিষ্ট আছেন। যজ্ঞধূমে তখনও আশ্রম আচ্ছন্ন ও আমোদিত। কিন্তু গৃহটী চারি ধারেই মুক্তদ্বার এবং বায়ুসেবিত। সুতরাং যজ্ঞধূম শীঘ্রই গৃহ ছাড়িয়া দ্যুলোকাভিমুখে চলিল। ইহাতে যে দেবতা বা উপাসকের তৃপ্তি হয়, হউক; তপোগৃহে যে ব্যক্তিত্রয় সমবেত, ইঁহারা স্পষ্টতঃই ইহাতে পরিতৃপ্ত নহেন, কারণ ধূমনির্গমের সঙ্গে ইঁহারা আত্মতত্ত্ব আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। মৈত্রেয়ীই প্রথমে কথা তুলিলেন।

মৈত্রেয়ী।—আজ সেই কথা বলিতেই হইবে।

কাত্যায়নী।—কোন্ কথা, আর 'বলিতেই হইবে' এই জেদেরই বা অর্থ কি?

যাজ্ঞবল্ক্য।—মৈত্রেয়ী আত্মার একত্বের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আর 'বলিতেই হইবে' এই জেদের অর্থ এই যে বিবাহের পর প্রত্যহই ইনি এই বিষয় আলোচনার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন, কিন্তু কোন না কোন প্রতিবন্ধক-বশতঃ অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি নাই।

কাত্যায়নী।—আত্মার একত্বের বিষয় শুনিবার পূর্ব্বে 'আত্মা কি' এই বিষয় অগ্রে কথা হউক না কেন?

মৈত্রেয়ী।—এই বিষয় আমার জানিবার প্রয়োজন নাই।

কাত্যায়নী।—আমার প্রয়োজন আছে। তুমি আমাকে বল আত্মা বস্তুটা কি?

যাজ্ঞবল্ক্য।—তুমিই বল তুমি কি মনে কর।

কাত্যায়নী।—আমার বোধ হয়, যা'র প্রাণ আছে সেই আত্মা।

যাজ্ঞবল্ক্য।—প্রাণ কা'কে বল?

কাত্যায়নী।—কা'কে বলি?—(মুহূর্ত্ত কাল নীরব থাকিয়া)—ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না কি বলিব।

মৈত্রেয়ী।—প্রাণের কার্য্য কি কি? আমাদের প্রাণ আছে বলিয়া আমরা কি কি করি?

কাত্যায়নী।—ও! তাই জিজ্ঞাসা করিতেছ? প্রাণ আছে বলিয়া আমরা নিশ্বাস প্রশ্বাস করি, বাঁচিয়া থাকি।

যাজ্ঞবল্ক্য।—আহার পান, অন্ন, পরিপাক, এবং এতাদৃশ আরো কতিপয় কার্য্য ব্যতীত আমরা বাঁচিতে পারি না।

কাত্যায়নী।—তবে এ সকলও প্রাণের কার্য্য।

যাজ্ঞবল্ক্য।—আচ্ছা, যদি এমন একটা বস্তু দেখ, যাহা নিশ্বাস প্রশ্বাস, আহার, অন্নপরিপাক প্রভৃতি কার্য্য করে, কিন্তু যা'র সুখ দুঃখ প্রভৃতি কিছুরই বোধ নাই, তবে উহাকে আত্মা বল কি না?

কাত্যায়নী।—না, উহাকে প্রাণীমাত্র বলি, আত্মা বলি না।

মৈত্রেয়ী।—তবে যে তুমি বলিলে, 'যা'র প্রাণ আছে সেই আত্মা,' এই সংজ্ঞা ঠিক নয়।

কাত্যায়নী।—তাইত দেখিতেছি। যা'র চৈতন্য নাই তা'কে আত্মা বলিতে পারি না।

যাজ্ঞবল্ক্য।—'চৈতন্য' কা'কে বল? চৈতন্যের কার্য্য কি?

কাত্যায়নী।—'চৈতন্য' অর্থ—বোধ—জানা। জানাই চৈতন্যের কার্য্য।

যাজ্ঞবল্ক্য।—জানার দৃষ্টান্ত দাও।

কাত্যায়নী।—এই যেমন আমি তোমাকে ও মৈত্রেয়ীকে দেখিতেছি, আর তোমাদের কথা শুনিতেছি।

যাজ্ঞবল্ক্য।—তুমি যে রূপ দেখিতেছ, আর যে শব্দ শুনিতেছ, সে রূপ ও শব্দ সর্ব্বদা তুমি জান না।

কাত্যায়নী।—না, এখান হইতে উঠিয়া গেলে বা চক্ষু মুদিলেই আর রূপ দেখি না, আর তোমরা কথা না বলিলে, অথবা কাণ বন্ধ করিলেই আর শব্দ শুনি না।

যাজ্ঞবল্ক্য।—কিন্তু তখনও তোমার চৈতন্য থাকে?

কাত্যায়নী।—থাকে বই কি?

যাজ্ঞবল্ক্য।—দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, আঘ্রাণ, আস্বাদন—এই পঞ্চবিধ ইন্দ্রিয়কার্য্য বন্ধ হইলেও চৈতন্য থাকে?

কাত্যায়নী।—হাঁ, থাকে বই কি।

যাজ্ঞবল্ক্য।—তখন চৈতন্য কি কার্য্য করে? কি বা কা'কে জানে?

কাত্যায়নী।—তখন চৈতন্য আপনাকে জানে।

যাজ্ঞবল্ক্য।—তাহা হইলে আপনাকে জানাটাই চৈতন্যের কার্য্য?

কাত্যায়নী।—কেন? রূপ রসাদি জানাও ত চৈতন্যের কার্য্য।

মৈত্রেয়ী।—তুমি যে বলিলে রূপরসাদি না জানিলেও চৈতন্য থাকিতে পারে।

কাত্যায়নী। হাঁ, তা ত বলিয়াছি।

মৈত্রেয়ী—কিন্তু আপনাকে জানা চাইই; আপনাকে না জানিলে চৈতন্য থাকিতে পারে না।

কাত্যায়নী।—তা কেন? চৈতন্য কখনও রূপরসাদি জানে, কখনও বা আপনাকে জানে?

মৈত্রেয়ী।—যখন রূপরসাদি জানে তখন আপনাকে জানে কি না?

কাত্যায়নী।—জানিতেও পারে, না জানিতেও পারে।

মৈত্রেয়ী।—না জানা অসম্ভব। আমি যখন মুনিবরকে দেখি, তখন 'আমি দেখিতেছি' এটা না ভাবিয়া থাকিতে পারি না।

কাত্যায়নী।—তুমি কি রকম দেখ জানি না। আমি যখন মুনিবরকে এক মনে দেখি তখন ত আমার নিজেকে কিছুই মনে থাকে না।

এস্থলে মুনিবর ঈষৎ হাস্য না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। কাত্যায়নীর আত্মহারা প্রেমে তিনি চিরদিনই মুগ্ধ। কিন্তু মৈত্রেয়ীর গভীর ভক্তিতেও তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস। তবে, মৈত্রেয়ী যাহাই করুন, তাঁহার

আত্মচিন্তা সর্ব্বদাই জাগ্রত। কাত্যায়নী কেবল আত্ম চিন্তা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। যাহা হউক, কথা অবাধে চলিতে লাগিল।

যাজ্ঞবল্ক্য।—আচ্ছা, কাত্যায়নি, যখন তুমি কেবল আপনাকে জান, রূপরসাদিকে জান না, তখনও রূপরসাদিকে স্মরণ হয় কি না ?

কাত্যায়নী।—স্মরণ হয়।

যাজ্ঞবল্ক্য।—তুমি এক সময় এই গুলিকে জানিয়াছিলে এই বলিয়া স্মরণ হয় ?

কাত্যায়নী।—হাঁ, আমি এক সময় এই গুলিকে জানিয়াছিলাম বলিয়াই স্মরণ হয়।

যাজ্ঞবল্ক্য।—অর্থাৎ বস্তুগুলির স্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে বস্তুগুলির তখনকার জ্ঞাতাকেও স্মরণ হয়।

কাত্যায়নী।—হাঁ, তা হয়।

মৈত্রেয়ী।—সে কি রকম ? তুমি যা'কে আদতে জান নাই তাকে স্মরণ হয় কিরূপে ?

কাত্যায়নী।—জানি নাই কি রকম ?

মৈত্রেয়ী।—ঐ যে একটু আগে তুমি বলিলে রূপরসাদি জানিবার সময় আপনাকে না জানিতেও পার। আর মুনিবরকে এক মনে দেখিতে যাইয়া একেবারে আত্মবিস্মৃত হও।

কাত্যায়নী। হাঁ হাঁ ঠিক, দেখিবার সময় আপনাকে মনে থাকে না, পরে স্মরণ হয়, ইহাতে অসঙ্গত কি আছে ?

মৈত্রেয়ী।—যাহা জানা হয় নাই তাহা স্মরণ হইতে পারে না। স্মরণটা জানার পুনরাবির্ভাব মাত্র।

কাত্যায়নী।—তুমি বলিতে চাও যে রূপরসাদি জানিবার সময় যখন আমি আপনাকে রূপরসাদির জ্ঞাতা বলিয়া জানি নাই, তখন রূপরসাদির স্মরণের সময় আপনাকে রূপরসাদির জ্ঞাতা বলিয়া স্মরণ হওয়াও অসম্ভব ?

মৈত্রেয়ী।—হাঁ, তাই বলিতে চাই ; আর, যখন রূপরসাদি স্মরণের সময় আপনাকে এই গুলির জ্ঞাতা বলিয়াই স্মরণ হয়, তখন বুঝিবে, নিশ্চয়ই এই গুলি জানিবার সময় আপনাকেও জানিয়াছিলে।

কাত্যায়নী।—তাই ত, এযে বড় অদ্ভুত কথা। তোমাদের কথায় আমি কোন উত্তর দিতে পারিতেছি না বটে, কিন্তু আমি এই বিষয় ভালরূপ না ভাবিয়া শেষ কথাও বলিতে পারিতেছি না। 'আমি জানিতেছি' 'আমি শুনিতেছি' এরূপ কথা ত সকল সময় ভাবি না।

মৈত্রেয়ী।—এরূপ কথা ভাব না বটে, কিন্তু কথা গুলির মর্ম্ম যাহা তাহা আত্মায় নিহিত থাকে। আত্মপ্রত্যয় ছাড়া কোন প্রত্যয় হয় না, এই কথা মুনিবর আর বাবার মুখে বিবাহের পূর্ব্বেও অনেক বার শুনিয়াছি।

কাত্যায়নী।—আমিও সময় সময় শুনিয়াছি, কিন্তু পূর্ব্বে কিছুই বুঝিতে পারি নাই, বুঝিতে চেষ্টাও করি নাই। আচ্ছা, আত্মপ্রত্যয় কথাটার ঠিক অর্থ কি ?

মৈত্রেয়ী।—'আত্মপ্রত্যয়' অর্থ আমাতে বিশ্বাস, 'আমি আছি' এই বিশ্বাস। সমুদায় বিশ্বাসের সঙ্গে এই বিশ্বাস থাকে।

কাত্যায়নী।—আচ্ছা তাতে আমাদের আদত কথার কি হইল ?

মৈত্রেয়ী।—তুমি বলিয়াছিলে চৈতন্যের কার্য্য—জানা, আর জানাটা রূপরসাদি জানাও হইতে পারে, আপনাকে জানাও হইতে পারে ; এখন দেখিলে আত্মজ্ঞানই মূল জ্ঞান, রূপরসাদি জানিতে যাইয়াও আপনাকেই জান। আর রূপরসাদি না জানিলেও আপনাকে জান।

কাত্যায়নী।—তা' হ'লে জ্ঞান দু'রকম দাঁড়াইতেছে।

মৈত্রেয়ী।—দু'রকম নয়, এক রকমই। উভয় স্থলেই আত্মজ্ঞান।

কাত্যায়নী।—দু'রকম নয় কেন ? এক স্থলে আত্মা আর রূপরসাদি, আর অপর স্থলে কেবল আত্মা।

মৈত্রেয়ী।—উভয় স্থলেই আত্মা।

যাজ্ঞবল্ক্য।—আচ্ছা, এতদূর এখন যাইয়া কাজ নাই। এক অর্থে দু'রকম জ্ঞানই দাঁড়াইতেছে ; রূপরসাদির জ্ঞান অস্থির, অনিত্য ; আত্মজ্ঞান স্থির, নিত্য।

মৈত্রেয়ী।—জ্ঞান আত্মার ধর্ম্ম, আর আত্মা স্থির, অবিকৃত। তবে জ্ঞান অস্থির, অনিত্য হইবে কিরূপে ?

যাজ্ঞবল্ক্য।—এই কথা এখন ঠিক বুঝাইতে পারিব না,

ক্রমশঃ বুঝাইব। এখন এই পর্য্যন্ত বলি যে রূপরসাদি জানা, স্মরণ করা ও ভুলা, এই সকল ঠিক আত্মার কার্য্য নহে, মনের কার্য্য।

কাত্যায়নী।—মন আর আত্মা আবার ভিন্ন বস্তু নাকি?

যাজ্ঞবল্ক্য।—ভিন্নও বটে, অভিন্নও বটে। রূপরসাদি-বিষয়ক অস্থির জ্ঞানকে মনের কার্য্য বলিতেছি, আর স্থির আত্মজ্ঞানকে আত্মার কর্ম্ম বলিতেছি; এস্থলে ভিন্নতা। আবার আত্মজ্ঞানকে ছাড়িয়া রূপরসাদির জ্ঞান হইতে পারে না, আত্মাকে ছাড়িয়া মন থাকিতে পারে না, এস্থলে অভিন্নতা।

মৈত্রেয়ী।—ঠিক হ'য়েছে, এতদিনে আমার একটা সন্দেহ দূর হইল। সেই মহাসভার দিনে আপনি অন্তর্যামি-তত্ত্ব বুঝাইতে যাইয়া আত্মাকে সমুদায় বস্তুর অন্তর্যামী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্থলে যে সকল বস্তুর নাম করিয়াছিলেন তন্মধ্যে মন একটী। আপনার কথাগুলি পর্য্যন্ত আমার স্মরণ আছে। আপনি বলিয়াছিলেন,—"যো মনসি তিষ্ঠন্মনসোঽন্তরো যং মনো ন বেদ যস্য মনঃ শরীরং যো মনোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ"। * (যিনি মনে থাকিয়াও মন হইতে ভিন্ন, যাঁহাকে মন জানে না, মন যাঁহার শরীর, যিনি মনের ভিতরে থাকিয়া মনকে নিয়মিত করেন, তিনি তোমার আত্মা, তিনি অন্তর্যামী ও অমৃত।) আত্মা পৃথিবী, জল, অগ্নি প্রভৃতির নিয়ন্তা, এই কথা বেশ বুঝিয়াছিলাম, কিন্তু অন্যান্য বস্তুর ন্যায় মনও যে অজ্ঞান, পরতন্ত্র, আত্মা-কর্ত্তৃক নিয়মিত, এই কথা তখন বুঝিতে পারি নাই, এতদিনে বুঝিলাম।

কাত্যায়নী।—আমি এখনও বুঝি নাই। মনকে অজ্ঞান বলিতেছ কেন? মন ত রূপরসাদি জানে।

মৈত্রেয়ী।—আত্মজ্ঞান ছাড়া রূপরসাদির জ্ঞান হয় না।

কাত্যায়নী।—তাহা যেন নাই হইল, রূপরসাদিকে জানে ত মন? আত্মা ত কেবল আপনাকে জানে।

মৈত্রেয়ী।—আত্মা আপনাকেও জানে, রূপরসাদিকেও জানে।

কাত্যায়নী।—তবে আর একটা মন কল্পনা করিবার প্রয়োজন কি? মনের ত কোন কার্য্যই থাকিতেছে না, আর মুনিবর এই মাত্র না বলিলেন যে রূপরসাদি জানা, স্মরণ করা ও ভুলা, এই সকল মনের কার্য্য?

মৈত্রেয়ী।—হাঁ, মুনিবর তাহা বলিয়াছেন বটে, কিন্তু ইহাও বলিয়াছেন যে এই বিষয়টা এখন ভাল বুঝা যাইবে না, ক্রমশঃ বুঝা যাইবে।

যাজ্ঞবল্ক্য।—মৈত্রেয়ী বলিয়াছিলেন যে জ্ঞান যখন স্থির অবিকৃত আত্মার ধর্ম্ম তখন ইহা অস্থির হইতে পারে না; অথচ রূপরসাদির জ্ঞান অস্থির, সুতরাং রূপরসাদির জ্ঞানকে কিরূপে আত্মার ধর্ম্ম বলা যায়? এই বিরোধ ভঞ্জনের জন্য আমি বলিয়াছিলাম যে রূপরসাদির জ্ঞানকে মনের কার্য্য বলা যাক্। কিন্তু বস্তুতঃ আত্মাই সমুদায় বিষয়ের জ্ঞাতা।

কাত্যায়নী।—কিন্তু বিরোধ ভঞ্জন হইল কৈ? আত্মাই যদি প্রকৃত জ্ঞাতা হইল, তবে মন বলিয়া একটা বস্তু মানি কেন?

যাজ্ঞবল্ক্য।—আত্মা স্থির অবিকার্য্য। রূপরসাদির বিকারকে জানিতে যাইয়াও আত্মা স্থির অবিকৃতই থাকে। তবে বিকৃত হয় কি? রূপরসাদি কাহার বিকার? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলেই দেখিবে মন বলিয়া একটী অস্থির বিকারশীল বস্তু মানিতে হইবে। এই বস্তু ঠিক জ্ঞাতা নয়, আত্মাই জ্ঞাতা; অথচ আপাততঃ এই মনকেই আত্মা বলিয়া বোধ হয়।

মৈত্রেয়ী।—এবারে আমারও মন সম্বন্ধীয় ধারণা পরিষ্কার হইল। মানুষ যেমন ভ্রমক্রমে শরীরকে জ্ঞাতা মনে করে, তেমনি ভ্রম বশতঃই মনকেও জ্ঞাতা বলিয়া কল্পনা করে।

যাজ্ঞবল্ক্য।—আচ্ছা বেশ। এখন আবার মূল কথায় যাওয়া যাক্। এখন তোমরা বল আত্মা কি?

কাত্যায়নী।—আত্মার ধর্ম্ম জ্ঞান,—আত্মজ্ঞান আর রূপরসাদি বিষয়ের জ্ঞান।

---

* বৃহদারণ্যক উপনিষদ, তৃতীয় অধ্যায়, সপ্তম ব্রাহ্মণ।

যাজ্ঞবল্ক্য।—তার পর আর জ্ঞাতব্য কি?

কাত্যায়নী।—আমার আপাততঃ আর কিছু জ্ঞাতব্য নাই।

মৈত্রেয়ী।—আমার জিজ্ঞাসার উত্তর এখনও কিছুই দেওয়া হয় নাই। আমি জিজ্ঞাসা করি আত্মার একত্বের প্রমাণ কি? ভিন্ন ভিন্ন জীবের আত্মা ভিন্ন ভিন্ন, ইহাই ত আপাততঃ ঠিক বলিয়া বোধ হয়।

যাজ্ঞবল্ক্য।—আত্মাকে প্রকৃতরূপে জানিলে তাঁহার একত্বও প্রতীত হয়। প্রকৃতরূপে না জানাতেই ভেদবোধ আসে। জীবে জীবে যে ভেদ নাই, তাহা নহে; কিন্তু সে ভেদ আত্মগত নহে, বিজ্ঞানগত।

কাত্যায়নী।—বিজ্ঞান কি?

মৈত্রেয়ী।—আমিও তাহা জানিতে চাই। সেই সভায় অন্তর্য্যামিতত্ত্ব ব্যাখ্যানে আপনি যেমন আত্মা মনে ভেদ করিয়াছিলেন, তেমনি আত্মা আর বিজ্ঞানেও ভেদ করিয়াছিলেন। মন আর আত্মার ভেদ এখন বুঝিতে পারিয়াছি, কিন্তু বিজ্ঞান আর আত্মার ভেদ এখনও বুঝিতে পারিতেছি না।

কাত্যায়নী।—তোমার এত কথাও মনে থাকে! মুনির ঠিক কথাগুলি তুমি আওড়াইতে পার?

মৈত্রেয়ী।—ঠিক পারিব। কিন্তু ইহাতে আমার বেশী বাহাদুরি নাই। কারণ, শ্রোতৃবর্গের সুখবোধের জন্য মুনিবর ঐ ব্যাখ্যানের প্রত্যেক অংশে প্রায় একই কথা ব্যবহার করিয়াছিলেন। বিজ্ঞান সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন,—"যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্ বিজ্ঞানাদন্তরো যং বিজ্ঞানং ন বেদ যস্য বিজ্ঞানং শরীরং যো বিজ্ঞানমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যামামৃতঃ।" এখন আমি জানিতে চাই বিজ্ঞান ও আত্মায় প্রভেদ কি?

কাত্যায়নী।—আগে 'বিজ্ঞান' অর্থ বুঝি, তার পর প্রভেদের কথা।

যাজ্ঞবল্ক্য।—তোমরা বলিতেছ 'আত্মা' অর্থ জ্ঞাতা। আচ্ছা, আত্মা যে আপনাকে জানে, সেই জানাতে আপনাকে অন্য হইতে পৃথক করে কি না?

কাত্যায়নী।—আত্মা রূপরসাদি হইতে আপনাকে ভিন্ন বলিয়া জানে।

মৈত্রেয়ী।—প্রত্যেক আত্মা আপনাকে অন্য আত্মা হইতে ভিন্ন বলিয়া জানে।

যাজ্ঞবল্ক্য।—(গৃহস্থিত দীপের দিকে চাহিয়া) এই দীপটী হইতে আত্মা ভিন্ন কি দীপটীর সহিত এক?

কাত্যায়নী।—নিশ্চয়ই ভিন্ন। আমি এখানে না থাকিলেও এই দীপ থাকিবে।

যাজ্ঞবল্ক্য।—আমার দেখার সহিত ইহা ভিন্ন কি এক?

কাত্যায়নী।—দেখা হইতেও ভিন্ন, আমি না দেখিলেও ত ইহা থাকিবে।

মৈত্রেয়ী।—কিন্তু দেখার সময় এক; দীপ না থাকিলে 'দীপ দেখা' হয় না।

যাজ্ঞবল্ক্য।—তা'হইলে 'দেখা' হইতে ইহাকে ভিন্ন করা যায় না।

মৈত্রেয়ী।—দেখার সময় করা যায় না। দেখার সময় দীপ ও দীপের দ্রষ্টা সংযুক্ত, কিন্তু যখন দেখা হয় না, তখন দু'য়ে অসংযুক্ত।

কাত্যায়নী।—দেখার সময় দু'য়ে সংযুক্ত বটে, কিন্তু এক নয়, ভিন্ন।

যাজ্ঞবল্ক্য।—সংযোগটা কিসে হয়? যোগসূত্র কি?

মৈত্রেয়ী।—যোগসূত্র—জ্ঞান।

যাজ্ঞবল্ক্য।—যোগসূত্র যুক্ত উভয় বস্তুতে থাকা চাই?

মৈত্রেয়ী।—হাঁ, থাকা চাই বই কি?

যাজ্ঞবল্ক্য।—তবে জ্ঞান দ্রষ্টা ও দৃষ্ট উভয়ত্রই আছে?

মৈত্রেয়ী।—উভয়ত্রই আছে।

কাত্যায়নী।—দীপে জ্ঞান আছে—এ কি রকম?

মৈত্রেয়ী।—'দীপে জ্ঞান আছে' বলিলে ভুল বুঝাইতে পারে, কিন্তু 'দীপ জ্ঞানে আছে, এই কথা মানিতে হইবে। দীপ জ্ঞানে না থাকিলে বা না আসিলে দীপকে জানাই হয় না। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি দীপকে যখন আমি জানি না তখনও ইহা জ্ঞানে থাকে কি না?

কাত্যায়নী।—তার আগে আমি জানিতে চাই জ্ঞানে থাকা আর আত্মায় থাকা একই কি না।

মৈত্রেয়ী।—জ্ঞান আত্মা ছাড়া নয়; জ্ঞানে থাকা আর আত্মায় থাকা একই কথা।

কাত্যায়নী।—তা' হ'লে দেখার সময় দীপ আত্মায় থাকে?

মৈত্রেয়ী।—তা'ত ঠিকই দেখিতেছি।

কাত্যায়নী।—সেই আত্মা কোন্ আত্মা যাহাতে দেখার সময় দীপ ও দীপের দ্রষ্টা দুইই থাকে?

মৈত্রেয়ী।—কোন্ আত্মা? যে আত্মাকে আমরা প্রত্যেকে 'আমি' বলি, সেই আত্মা ছাড়া আর কোন্ আত্মা হইবে?

কাত্যায়নী।—কিন্তু দীপটী ত আমাতেও নয় তোমাতেও নয়। তুমি আমি দীপ হইতে ভিন্ন।

মৈত্রেয়ী।—দীপ হইতে ভিন্ন অথচ দীপের সহিত সংযুক্ত; আর এই সংযোগের সূত্র জ্ঞান—আমারই জ্ঞান—অর্থাৎ আমিই! কি আশ্চর্য্য! এই সকল কথাতে অতি গভীর তত্ত্ব আছে বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু আমি এখনও তাহা ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। আমার বোধ হইতেছে যেন আমার—যা'কে 'আমি' বলি সেই আত্মার—কতকটা দীপে আর কতকটা আমার শরীরে। অথবা আমি এমন একটা বৃহৎ বস্তু যাহাতে দীপ, শরীর আর সমস্ত বস্তু ধৃত রহিয়াছে। অথচ আমি জানি আমি এত বড় বস্তু নই।

কাত্যায়নী।—দীপ তোমাতে থাকিলে তোমার সঙ্গে সঙ্গে চলিত, কিন্তু তা'ত আর হয় না। তুমি এখানে না থাকিলেও দীপ থাকিবে।

যাজ্ঞবল্ক্য।—দীপটীকে এখন যেমনটী দেখিতেছ ঠিক তেমনটীই থাকিবে?

কাত্যায়নী।—ঠিক তেমনটীই থাকিবে।

যাজ্ঞবল্ক্য।—এখন ইহা জ্ঞানে আছে; এখন ইহা দৃষ্ট বস্তু; যখন তুমি ইহাকে দেখিবে না তখন ইহা জ্ঞানে থাকিবে কি না? দৃষ্ট থাকিবে কি না?

কাত্যায়নী।—না, জ্ঞানে থাকিবে না, দৃষ্ট থাকিবে না।

মৈত্রেয়ী।—তবে আর ঠিক এখনকার মত রহিল কৈ?

কাত্যায়নী।—আচ্ছা মনে কর ইহার কিছু পরিবর্ত্তন হইবে। ইহার দৃষ্টত্বটা থাকিবে না, আর সকল গুণ থাকিবে।

মৈত্রেয়ী।—এখন দৃষ্টত্বেরই কথা হইতেছে অন্য গুণের কথা হইতেছে না। এখন আমি দীপের রূপ জানিতেছি; আমার না দেখার সময় যদি ইহার রূপ না থাকে তবে কার্য্যতঃ ইহার না থাকাই হইল।

কাত্যায়নী।—কিন্তু রূপ যে থাকে না, তা'ত ভাবা যায় না। "আছে" ভাবিলে রূপও ভাবিতে হয়।

মৈত্রেয়ী।—তা'হইলে "দৃষ্ট"ও ভাবিতে হয়, ইহার দ্রষ্টাও ভাবিতে হয়।

যাজ্ঞবল্ক্য।—এখন যে জ্ঞানে আছে, সেই জ্ঞানেই ভাবিতে হয়।

মৈত্রেয়ী।—তা'ত দেখিতেছি। তাহা না ভাবিলে ভাবনাই হয় না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! দীপটী আমি কখনও দেখি, কখনও দেখি না; দীপটী ছাড়াও আমি বেশ থাকিতে পারি; অথচ আর এক দিকে দেখি 'দীপটী আছে' এই বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে এটীও বিশ্বাস করিতে হয় যে দীপটী আমাতে আছে অথবা 'আমি দীপে আছি'। একি অদ্ভুত ব্যাপার! আমি যেন দ্বিধা হইয়া যাইতেছি। বিজ্ঞান আর আত্মার ভেদ আমি যেন আভাসে বুঝিতে পারিতেছি, কিন্তু আমি আভাসমাত্রে তৃপ্ত হইতে পারি না, আমাকে বিষয়টী ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে।

যাজ্ঞবল্ক্য।—তুমি দেখিতেছ যে আত্মা—যা'কে তুমি 'আমি' বলিতেছ সেই আত্মাই—সর্ব্বভূতে বিদ্যমান?

মৈত্রেয়ী।—তাই ত দেখিতেছি। কথাটী অনেকবার শুনিয়াছি কিন্তু ঠিক বুঝিতে পারি নাই। আপনি অন্তর্যামি-ব্যাখ্যানে 'যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্', 'যোঽপ্সু তিষ্ঠন্', 'যোঽগ্নৌ তিষ্ঠন্' ইত্যাদি বাক্যে এই তত্ত্ব বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি তখনও ঠিক বুঝিতে পারি নাই যে এই সর্ব্বভূতস্থ সর্ব্বান্তর্যামী আত্মাই আমার আত্মা।

যাজ্ঞবল্ক্য।—কেন, আমি ত ঐ ব্যাখ্যানের প্রত্যেকাংশেই বলিয়াছিলাম—'এষ ত আত্মা' (ইনি তোমার আত্মা)।

মৈত্রেয়ী।—হাঁ তা বলিয়াছিলেন বটে, আর আমার

বিশ্বাস এই যে জগদাত্মাই আমাদের প্রত্যেকের আত্মা, কিন্তু এই দীপের দৃষ্টান্তে যেমন স্পষ্টই দেখিতেছি যে দীপস্থ আত্মা ও শরীরস্থ আত্মা একই, এমন স্পষ্ট ভাবে কথাটা পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই। যাহা হউক, স্পষ্টভাবে দেখিলেও আমি এখনও সম্পূর্ণরূপে সন্দেহমুক্ত হইতে পারি নাই। জিজ্ঞাসা করি—যদি দীপের আধাররূপী আত্মাই আমার আত্মা হইলেন, তবে দীপটী সকল সময়ে আমার জ্ঞানে থাকে না কেন? জগদাত্মাতে জগৎ সর্ব্বদাই থাকে, আর আমি জগদাত্মার সঙ্গে এক; তবে জগৎ সর্ব্বদা আমার সাক্ষাতে থাকে না কেন?

কাত্যায়নী। জগদাত্মাতে জগৎ সর্ব্বদাই থাকে, ইহা মানি বটে, কিন্তু আজকার কথায় ইহার কি প্রমাণ হইল?

মৈত্রেয়ী।—তুমি পূর্ব্বকার কথা ভুলিয়া যাইতেছ। দেখার সময় আমরা দেখি একটা জ্ঞান—একটা আত্মা—দৃষ্ট দীপে যে জ্ঞান সেই জ্ঞানই দ্রষ্টা জীবে ফুটিয়া উঠিতেছে। আর, দীপের এই যে দৃষ্টত্ব,—এই যে দীপের জ্ঞানে অবস্থিতি,—এটা দীপ হইতে ছাড়াইবার যো নাই। আমরা যে দীপ দেখিবার সময় এই ধর্ম্মটা দীপে আরোপ করি তা' নয় আমরা ইহা দীপে আবিষ্কার করি। সুতরাং বুঝিতে হইবে ইহা দীপের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। দীপে যাহা দেখিতেছি সকল বস্তুতেই তাহা বুঝিতে হইবে।

কাত্যায়নী।—তাইত, তুমি মুনিবরের অল্প কথায় এত বেশি বুঝিয়া লইলে কি রূপে? তুমি এমন করিয়া না বলিলে আমি বুঝিতে পারিতাম না। এখনও ঠিক বুঝিয়াছি কি না জানি না।

মৈত্রেয়ী।—তুমি আমাকে অতিরিক্ত প্রশংসা করিতেছ। এই সকল কথা যে আমি এই প্রথম শুনিতেছি তাহা নয়। বিবাহের পূর্ব্বে অনেকবার শুনিয়াছি, অনেক ভাবিয়াছি। কিন্তু তোমার ঘরে আসিয়া যেমন বুঝিতেছি, আগে তেমন বুঝি নাই।

কাত্যায়নী।—ঘরের মাহাত্ম্যটা তোমার আসাতেই হইয়াছে।

মৈত্রেয়ী।—তা, নয়। যাহা হউক, সে কথা যাক্। আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম তা'র উত্তর চাই। জগদাত্মাই যদি আত্মা হইলেন, তবে আমি জগৎকে কখনও জানি না, এমন হয় কেন?

যাজ্ঞবল্ক্য।—জগদাত্মাই যে জীবের আত্মা এই বিষয়ে কোন সন্দেহ আছে কি না?

মৈত্রেয়ী।—সন্দেহের ত কোন কারণ দেখি না। জ্ঞানক্রিয়াতে ত স্পষ্টই দেখি জ্ঞেয়ে যিনি, জ্ঞাতাতেও তিনি। তিনি জ্ঞানরূপে আমাতে প্রকাশ হওয়াতেই আমার জগতের জ্ঞান হয়।

যাজ্ঞবল্ক্য।—জগদাত্মাতে জগতের জ্ঞান সর্ব্বক্ষণই থাকে?

মৈত্রেয়ী।—সর্ব্বক্ষণই ত থাকে।

যাজ্ঞবল্ক্য।—আর জগদাত্মাই তোমার আত্মা?

মৈত্রেয়ী।—হাঁ, জগদাত্মাই আমার আত্মা।

যাজ্ঞবল্ক্য।—তবে, তোমার আত্মাতেই জগৎ সর্ব্বক্ষণ থাকে? তোমার আত্মাই সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বাধার?

মৈত্রেয়ী।—বিচারে ত তাহাই পাইতেছি, কিন্তু আমি যে অল্পজ্ঞ, আমি যে কখনও জানি, কখনও জানি না, তাহা ত অস্বীকার করিতে পারি না।

যাজ্ঞবল্ক্য।—এই অল্পজ্ঞ আত্মা কখনও জানে, কখনও জ্ঞান ক্রিয়া করে; কখন জানে না। জগদাত্মার জ্ঞান ক্রিয়া নহে, তাঁহার জ্ঞান স্থির, অবিকৃত, নিত্য; আর অজ্ঞান তাঁহার পক্ষে অসম্ভব, সুতরাং এই অল্পজ্ঞ আত্মার সহিত জগদাত্মার ভেদ আছে। নয় কি?

মৈত্রেয়ী।—ভেদ ত দেখিতেছি। কিন্তু অভেদও পূর্ব্বে দেখাইয়াছেন। জগতের জ্ঞান যাওয়া আসাতেই ভেদ। কিন্তু দেখিতেছি জগতের জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে যে আত্মজ্ঞানটা থাকে, সেটা সর্ব্বদাই থাকে।

যাজ্ঞবল্ক্য।—কোন-না-কোন বিষয়ের জ্ঞান থাকে বলিয়াই আত্মজ্ঞান থাকে। প্রত্যেক বিষয় যা'বার সঙ্গে সঙ্গে এই বিষয়ের সম্পর্কিত আত্মজ্ঞান,—অর্থাৎ 'আমি এই বিষয়ের জ্ঞাতা' এই জ্ঞান—চলিয়া যায়। আত্মজ্ঞান যে থাকে, সে কোন বিষয়কে আশ্রয় করিয়া থাকে।

মৈত্রেয়ী।—কোন বিষয় সাক্ষাতে না থাকিলেও ত আত্মজ্ঞান থাকে।

যাজ্ঞবল্ক্য।—কোন বিষয়ভবনাকে আশ্রয় করিয়া থাকে। জীবগত আত্মজ্ঞান কোন বিষয়ের জ্ঞান বা বিষয় ভাবনার অপেক্ষা রাখে।

মৈত্রেয়ী।—তবে কি আত্মজ্ঞান কখনও বিলুপ্ত হয়? আমি আত্মজ্ঞানকে ধ্রুব, অপরিবর্ত্তনীয় ভাবিয়াছিলাম।

যাজ্ঞবল্ক্য। সুষুপ্তিতে আত্মজ্ঞানও বিলুপ্ত হয়। কিন্তু ভয় পাইবার কারণ নাই। আমি জীবগত অশুদ্ধ আত্মজ্ঞানের কথা বলিতেছি। শুদ্ধ আত্মজ্ঞান কখনও বিলুপ্ত হয় না। তেমনি শুদ্ধ যে বিষয়জ্ঞান—জগতের জ্ঞান—তাহাও কখনও বিলুপ্ত হয় না।

মৈত্রেয়ী।—বড় গোলমালে পড়িলাম। জগদাত্মা সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বাধার; তাঁ'রই জ্ঞান আমার জ্ঞান। তাঁ'র বিষয়জ্ঞান, আমার বিষয়জ্ঞান হয়। তাঁ'র আত্মজ্ঞান আমার আত্মজ্ঞান হয়; অথচ আমি তাঁহা হইতে ভিন্ন; আমি অল্পজ্ঞ, তিনি সর্ব্বজ্ঞ। এই ভিন্ন 'আমি' বস্তুটা কি?

যাজ্ঞবল্ক্য।—ইহারই নাম 'বিজ্ঞান' বা 'বিজ্ঞানাত্মা'; আর সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বাধার পুরুষ 'পরমাত্মা' 'শুদ্ধাত্মা'। জ্ঞানের আধার, জ্ঞানরূপী, তিনিই। কিন্তু এই যে তাঁহার ধ্রুব নিত্য জ্ঞানের প্রকাশ ও তিরোভাব, ইহাতেই জীবের জীবত্ব। এই বিজ্ঞানাত্মা জীব প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানের আধার নহে; ইহার জ্ঞান, সমস্তই পরমাত্মার, অথচ 'আমি দেখি' আমি শুনি' ইত্যাদি জ্ঞানক্রিয়ার কর্ত্তা রূপে, ও 'আমি দেখি না' 'আমি শুনি না' ইত্যাদি অভাবের ভোক্তারূপে ইহাকে ভাবা আবশ্যক। ইহার আত্মজ্ঞান সুষুপ্তি কালে বিলুপ্ত হয় বটে, কিন্তু জাগরণে পুনরায় ইহা আবির্ভূত হইয়া পূর্ব্বের জ্ঞান ও পরের জ্ঞানের একতা সাধন করে। এই বিজ্ঞানাত্মা পরমাত্মার অতি সন্নিকট হইয়াও, পরমাত্মার সহিত মূলে এক হইয়াও পরমাত্মা হইতে কি অর্থে ভিন্ন, কি অর্থে পরমাত্মা ইহার অন্তর্যামী, ইহার নিয়ন্তা, তাহা এখন ভাবিলেই বুঝিতে পারিবে।

মৈত্রেয়ী।—আমি বিশেষরূপে এই বিষয় ভাবিব। না ভাবিলে ভাল বুঝিতে পারিব না। এই বিষয়ে আরো অনেক জিজ্ঞাস্য আছে। আমি যে একত্ব বুঝিতে চাহিয়াছিলাম; তাহার কতকটা বুঝিতেছি কিন্তু আরো ভাল করিয়া বুঝিতে চাই।

কাত্যায়নী।—আজ আর না, আর এক দিন ভাল করিয়া বুঝিও। আজ অনেক রাত্রি হইয়াছে। আমার অত্যন্ত ঘুম পাইতেছে।

মৈত্রেয়ী।—তুমি ঘুমাইতে যাও না। আমি ইঁহার কথা আরো শুনি।

কাত্যায়নী।—কথা ত আমিও শুনিতে চাই, কিন্তু আমি তোমার মত এত রাত্রি জাগিতে পারি না।

মৈত্রেয়ী।—রাত্রি জাগিবার প্রয়োজন নাই। তোমার অনুপস্থিতিতে যে যে কথা হয়, সে সমস্ত কাল তোমাকে বলিব।

কাত্যায়নী।—তা'তে আমার তৃপ্তি হইবে না।

মৈত্রেয়ী।—তবে একটু বসিয়াই যাও না। তোমার ঘুম পাইতেছে বলিতেছ, কিন্তু আমি ত অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তোমার ঘরে শব্দ শুনি। এত কথা কি বল? আর তখন ঘুমই বা যায় কোথা?

কাত্যায়নী।—তুমি যে মাথা গরম করিয়া দাও, ক্ষণিকক্ষণ অন্য কথা না বলিলে মাথা ঠাণ্ডা হয় না, ঘুমও চাপিয়া আসে না।

মৈত্রেয়ী।—(ঈষৎ হাস্যের সহিত) আচ্ছা, আমি তোমার ভাব বুঝিয়াছি। আমি তোমার সুখে ব্যাঘাত দিতে চাহি না। তুমি মুনিবরকে লইয়া তোমার ঘরে যাও। আমি যাহা যাহা শুনিলাম, সে সব বিষয় ক্ষণিক চিন্তা না করিয়া শুইতে পারি না।

কাত্যায়নী মুনিবর সহ শয়নগৃহে গেলেন ও স্ত্রীজন-সুলভ বিস্রম্ভালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে মৈত্রেয়ী নিস্তব্ধ তপোগৃহে গভীর ধ্যানে নিমগ্না হইলেন। আপাততঃ বোধ হয় কাত্যায়নীই স্বামিসহবাসে, মৈত্রেয়ী স্বামী হইতে বিচ্ছিন্ন। বস্তুতঃ তাহাই কি? যাজ্ঞবল্ক্য শয়নগৃহে না তপোগৃহে?

—

ভারতে মুসলমান মহিলার বর্ত্তমান অবস্থা।*

ইসলামধর্ম্মে নারীজাতির প্রকৃত স্থান সম্বন্ধে পশ্চিম-দেশীয়গণের মনে কতকগুলি ভ্রান্ত সংস্কার রহিয়াছে; সেইজন্য ভারতবর্ষীয় মুসলমান নারীর অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহারা নানাপ্রকার ভ্রান্তিপূর্ণ ধারণা পোষণ করিতেছেন। আরবদেশ ইসলামধর্ম্মের জন্মভূমি। ইসলামের প্রাদুর্ভাবের পূর্ব্বে সে দেশে নারীজাতির যে অবস্থা ছিল, সেই আদর্শ অবলম্বন করিয়া বিচার করাতেই এই সকল ভ্রমের উৎপত্তি হইয়াছে।

ইসলামধর্ম্ম প্রচারের পূর্ব্বে আরবদেশে নারীজাতির অবস্থা কতদূর শোচনীয় ছিল, এক্ষণে আমাদিগের পক্ষে তাহা কল্পনা করাও কঠিন। সেই সময়ে নারীগণ তথায় পশুর ন্যায় ব্যবহৃত হইতেন, পিতৃধনে তাঁহাদিগের কোন অধিকার ছিল না; অভিভাবকগণ গো মেষের ন্যায় স্বচ্ছন্দে তাঁহাদিগকে দান বিক্রয় করিতেন। শিশুকন্যাকে হত্যা অথবা জীবন্ত সমাহিত করা কিছুমাত্র দোষের মধ্যে পরিগণিত ছিল না। বহুপত্নীত্ব ও বহুপতিত্ব উভয়ই বিদ্যমান ছিল। বিবাহবন্ধন ছিল না বলিলেই হয়। সাময়িক দাম্পত্যবন্ধন প্রভৃতি ঘৃণিত আচার ও নানাপ্রকার লোমহর্ষণকারী প্রথা প্রচলিত ছিল। আরবের এই প্রকার তমসাচ্ছন্ন অবস্থায় মহাপুরুষ মহম্মদের আবির্ভাব হয়। তিনি সমাজে নারীর ন্যায্য অধিকার স্থাপন করিলেন, পিতৃধনে তাঁহার অধিকার জন্মিল। নারী তখন স্বীয় সম্পত্তি ও দেহের অধিকারিণী হইলেন। বালিকাবধ স্থগিত হইল। বিবিধপ্রকারের ঘৃণিত বিবাহপ্রথা ও নারীর বহুপতিত্ব রহিত হইল, পুরুষকেও এককালে চারি পত্নীর অধিক গ্রহণ করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া বহু-বিবাহকে সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ করা হইল। ইসলাম ধর্ম্মের অভ্যুদয়ে আরব নারীর দুর্দ্দিন ঘুচিল। সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় পৃথিবীর শিক্ষিত মুসলমানগণ, বিশেষতঃ ভারতীয় মুসলমানগণ কোরাণ সমর্থিত চারি বিবাহও অনাবশ্যক বলিয়া মনে করিতেছেন।

অবরোধ প্রথা সম্বন্ধেও মুসলমানধর্ম্মকে অযথা আক্রমণ করা হয়। ভারতবর্ষে প্রচলিত কঠোর অবরোধপ্রথা কোরাণের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। এ দেশের অবরোধ প্রথার জন্য হিন্দুগণই দায়ী। মনু খৃষ্টের প্রায় নয় শত বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার সংহিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাহা পাঠ করিলে দেখা যায় মুসলমানগণের আগমনের বহু পূর্ব্বে এদেশে অবরোধ প্রথা প্রচলিত ছিল। মুসলমানগণ এ বিষয়ে হিন্দুদিগের সাহায্য করিয়াছেন মাত্র। মহম্মদীয় আইন সংক্রান্ত সুবিখ্যাত "হেদায়া" গ্রন্থে পরিষ্কার লিখিত আছে, "স্ত্রীলোকের মুখ ও হস্ততল পুরুষের দৃষ্টিগোচর হইতে পারে, কারণ কার্য্য উপলক্ষে নারীকে অহরহঃ পুরুষের সংস্পর্শে আসিতে হয়, শরীরের এ সকল অংশ আবৃত থাকিলে নিতান্ত অসুবিধা ঘটে। অতএব নারীগণের শরীরের উপরোক্ত অংশ অনাবৃত রাখা আবশ্যক।" সকল দেশে মুসলমান সমাজে অবরোধপ্রথা প্রচলিত নাই। আফ্‌গান, আফ্রিদি ও বেদুইন জাতির মধ্যে অবরোধ প্রথা অজ্ঞাত। যাবাদ্বীপ নিবাসী মুসলমান স্ত্রীলোকগণ তাঁহাদিগের ডচ্ ভগিনীগণের ন্যায় পূর্ণ স্বাধীনতা উপভোগ করেন। মুসলমান রাজ্য তুরস্কের রাজধানী কনষ্টান্টিনোপল নগরে নারীগণ সমাজে স্বাধীন ভাবে বিচরণ করেন, পত্রিকা সম্পাদনও সাহিত্য চর্চ্চা করিয়া থাকেন। প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র মুসলমান-নারী সেখান হইতে মক্কা নগরে তীর্থ যাত্রা করেন ও পুরুষদিগের সমক্ষে ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্পন্ন করেন।

এখন ভারতীয় মুসলমান রমণীর গার্হস্থ্য জীবন সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। এখানে গৃহরাজ্যে রমণীই রাজ্ঞী, আপনার সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং পরম সুখী। সন্তানগণ তাঁহার নিকট আনন্দের উৎস। তাহাদিগের সেবায় তিনি স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করেন। উষাকালে তাঁহার কন্যাগণ গাত্রোত্থান করিয়া পরমেশ্বরের উপসনা করেন ও গৃহকর্ম্মে

* 'হিন্দুস্থান রিভিউ' পত্রে সৈয়দ সুলতান আহ্‌মদ লিখিত ইংরেজী প্রবন্ধের মর্ম্মানুবাদ। ভাঃ মঃ সঃ

প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে এক অধ্যায় কোরাণ পাঠ করেন। তাঁহারা সূচীকর্ম্মে ইউরোপীয় মহিলাগণ অপেক্ষা অধিকতর পারদর্শিণী। গৃহকার্য্য সমাধা হইলে তাঁহারা বন্ধুগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান অথবা সমাগত বন্ধুগণের সহিত কথোপকথন করেন। তাঁহারা সায়ংকাল স্বামীর সহিত অতিবাহিত করেন। স্বামীই মুসলমান রমণীর সর্ব্বস্ব। তাঁহার আত্মা ও জীবন স্বামীর সহিত গ্রথিত। দিবসের শ্রান্তির পর স্বামীকে সুখী করিতে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। হৃদয়ের শান্তি ও গার্হস্থ সুখ বিষয়ে মুসলমান রমণী নিশ্চয়ই পরম সৌভাগ্যবতী। তাঁহার জীবন আদর্শস্থানীয় ও বিচিত্রতা-পূর্ণ না হইতে পারে, রঙ্গালয়ে অথবা নৃত্যগীতাদির আমোদ প্রমোদ হইতে তিনি বঞ্চিত হইতে পারেন, কিন্তু পতিপুত্রের সংসর্গে তিনি যে আনন্দলাভ করেন তাহাতেই তাঁহার আশা ও শ্রম পূর্ণ চরিতার্থতা লাভ করে।

ভারতীয় মুসলমান সমাজে বিবাহভঙ্গ (divorce) কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অত্যাচার মুসলমান সমাজে সচরাচর দৃষ্ট হয় না। রাজবিধি ও দেশাচার এই প্রকার অত্যাচারের প্রবল প্রতিষেধক। এ বিষয়ে ইউরোপীয় মহিলা অপেক্ষা ভারতীয় মুসলমান নারীর অবস্থা উৎকৃষ্ট। ভারতীয় মুসলমান-পত্নী গৃহে সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। সুপ্রসিদ্ধ চিন্তাশীল লেখক রস্কিন লিখিয়াছেন, "গৃহের শৃঙ্খলা, সুখ ও প্রীতি বর্দ্ধন করাই নারীর গৃহকর্ম্ম সম্বন্ধীয় কর্ত্তব্য।" এই সূত্র অনুসারে ভারতরমণী, বিশেষ ভাবে ভারতের মুসলমান মহিলা প্রচুর শ্রদ্ধার অধিকারিণী। নানা প্রকার জটিলতাবিশিষ্ট জীবন যাত্রা সুচারুরূপে নির্ব্বাহ বিষয়ে দক্ষতা লাভকে যদি শিক্ষা বলা যায়, তবে ভারতের মুসলমান মহিলাগণ নিশ্চয়ই শিক্ষিতা। কিন্তু যদি দেশের উন্নতিকর বিবিধ কার্য্যে সাহায্য করা, গৃহের বাহিরেও স্বামীর সুখ দুঃখের অংশ ভাগিনী হওয়া এবং সন্তানগণের উপর মানসিক প্রভাব বিস্তার করাও তাঁহার কার্য্য হয়, তবে স্বীকার করিতে হইবে যে এ সকলের সহিত মুসলমানমহিলার কোনই সংশ্রব নাই, এবং এই সম্পর্করাহিত্যই বর্ত্তমান সময়ে আমাদিগের পার্থিব উন্নতির অন্তরায়। এই অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধনে আমাদিগকে বদ্ধপরিকর হইতে হইবে। আমাদিগের ভবিষ্যদ্বংশের, আমাদিগের সমাজের ও মাতৃভূমির কল্যাণের জন্য, মুসলমান রমণীকে শ্রেষ্ঠতরা স্ত্রী, দক্ষতরা জননী এবং ইসলামধর্ম্মের ও দেশের কল্যাণ সাধনে অধিকতর শক্তিশালিনী করিবার উপায় উদ্ভাবনে আমাদিগকে মনোযোগী হইতে হইবে। পথে অনেক কঠিন অন্তরায় আছে, সে সকল দূর করিতে হইলে প্রচুর সৎসাহসের প্রয়োজন; আমাদিগকে এই পুরুষকার প্রদর্শনের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

প্রধান অন্তরায় অবরোধ প্রথা। কিন্তু এ বিষয়ে হঠাৎ বিপ্লব আনয়নের চেষ্টা না করিয়া ধীরপদে অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য। প্রথমে আরব ও পারস্যদেশ প্রচলিত অবরোধ প্রথা গ্রহণ করিলে ভারতবর্ষে প্রচলিত প্রথার কঠোরতা অনেক হ্রাস হয়, কিন্তু অবরোধ প্রথার কাঠিন্য দূর করিবার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান নারীর উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধেও আমাদিগকে মনোযোগী হইতে হইবে। সেই শিক্ষা কি প্রণালীতে আরম্ভ হইবে ও কি কি বিষয়ে প্রথমে শিক্ষা দিতে হইবে, তাহার আভাস দিবার জন্য স্থূলতঃ শিক্ষণীয় বিষয়গুলির নামোল্লেখ করা যাইতে পারে, যথাঃ—(১) কোরাণ ও ইসলাম ধর্ম্মের মূলসূত্র। (২) উর্দ্দূ ও ইংরেজী ভাষা লেখন ও অধ্যয়ন। (৩) ভারতবর্ষ, ইংলণ্ড ও ইসলাম ধর্ম্মের ইতিহাস; এবং ভূগোল। (৪) প্রাথমিক পাটীগণিত। (৫) সূচীকর্ম্ম ও রন্ধন বিদ্যা। (৬) স্বাস্থ্য বিজ্ঞান, শিশুপালন ও শুশ্রূষা ইত্যাদি। প্রয়োজনানুসারে উল্লিখিত বিষয়গুলির পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে, কিন্তু ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এদেশীয় মুসলমান-নারী ভারতমাতার কন্যা, শুধু মুসলমান সমাজের প্রতি নহে, কিন্তু মাতৃভূমির প্রতিও তাঁহার কর্ত্তব্য আছে। তিনি গরীয়সী ভারতমাতার দুহিতা।

ভারতের মুসলমান যুবকদিগকে আমরা অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা একবার আমাদিগের অতীত ইতি-হাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। আমরাই প্রথমে

বর্ত্তমান সভ্যতার মূলসূত্র ইউরোপখণ্ডকে দিয়াছিলাম, আমরাই ইউরোপে সর্ব্বপ্রথম মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করিয়াছিলাম, আমরাই সমীকরণ সম্বন্ধীয় কঠিন তত্ত্ব সকল প্রথম অবিষ্কার করিয়াছিলাম, ত্রিকোণমিতি বিদ্যার জন্য সমস্ত জগৎ আমাদিগের নিকট ঋণী। আমাদিগের অতীত ইতিহাস এই প্রকার গৌরবময়। কিন্তু ভারত আমাদের মাতৃভূমি, আমরা তাঁহার নিকট অশেষ ঋণে ঋণী। এই মাতৃ-ঋণ পরিশোধ কার্য্যে আমাদিগকে যত্নশীল হইতে হইবে। তিনি সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার মুসলমান সন্তানের নিকট স্বকন্ঠা চাহিতেছেন।

জ্ঞানবৃক্ষের ফল।

ইংরাজ কবি Gray বলিয়াছেন—'where ignorance is bliss 'tis folly to be wise." অর্থাৎ যেখানে অজ্ঞানেই সুখ, সেখানে জ্ঞানী হওয়াই মূর্খতা।

বাইবেলের আদিগ্রন্থে জগতের আদি পুরুষ ও আদি নারীর ইতিহাসেও সেই কথা। বাইবেলের মতে মানবের জ্ঞানার্জ্জনই তাহার প্রথম পাপ ও সকল দুঃখ দুর্গতির মূল কারণ। জ্ঞানবৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিয়াই মানব আধিব্যাধি, জরামৃত্যু, হিংসা ও শোকের অধীন হইয়াছে, নতুবা সে অজর অমর, ও দুঃখ শোকের অতীত হইয়া স্বর্গতুল্য ইডেনে দেবতার মত বিহার করিত।

যে জ্ঞান অন্ধকে চক্ষুষ্মান্ করে, দুর্ব্বলকে বলী করে, দূরতরকে নিকটতর করে, চক্ষুর অগোচর শক্তি সমূহকে করতলস্থ করিয়া দেয়, তাহা আলোকের মত পবিত্র, উজ্জ্বল ও প্রাণপ্রদ রূপে কল্পিত না হইয়া প্রাচীন ইহুদী দিগের ধর্ম্মগ্রন্থে কিরূপে অন্ধকারের চিরসঙ্গী পাপ রূপে কল্পিত হইল, তাহা বুঝিয়া উঠা ভার।

অথচ, এই প্রাচীন আখ্যায়িকার মধ্যেও একটি গূঢ় সত্য নিহিত আছে। শুভাশুভ জ্ঞান না থাকিলে অনেক দুঃখকষ্ট সংসার হইতে চলিয়া যাইত। পশুগণের সদসৎ জ্ঞান নাই, হিতাহিত, সত্য মিথ্যা, পাপপুণ্য বিচার করিবার শক্তি নাই; এই জন্য লজ্জার ধার তাহারা ধারে না, অন্তরের অনুতাপ ও বাহিরের দণ্ডভয় তাহাদিগকে ক্লেশ দেয় না। যেখানে জ্ঞানের অভাব, সেখানে পাপ পুণ্যেরও অভাব।

কিন্তু যে জ্ঞান মানবকে প্রকৃত মনুষ্যত্ব দিয়া পশুপদবী হইতে উর্দ্ধে উন্নীত করিয়াছে, যাহা তাহাকে দেবত্বের উত্তরাধিকারী করিয়াছে, বিধাতার সেই দুর্ল্লভ দান মানব জীবন কেবলই দুঃখময় কেন করিবে, এবং কিরূপে করিবে?

জ্ঞানের উষালোকে দাঁড়াইয়া, আদি নর আদম ও আদি নারী হবা যখন পরস্পরের মুখের দিকে চাহিলেন, উভয়ের সুন্দর মুখমণ্ডলে যখন প্রথম লজ্জার রক্তিম আভা ফুলের মত ফুটিয়া উঠিল, তখন সেই অননুভূতপূর্ব্ব ভাব রাশি তাহাদের কাছে দুঃখের মত লাগিয়াছিল কি কি সুখের মত লাগিয়াছিল জানি না। কিন্তু তাহাতে তীব্র বেদনার কিছু ছিল বলিয়া কল্পনা করা যায় কি? সেই দিন কি তাহারা অনুভব করেন নাই যে, তাহারা পরস্পরের নিতান্ত আপন ও একান্ত আত্মীয় হইলেও দুই দেহে বাস করিতেছেন, এবং তাহাদের পরেই সমস্ত জগৎ—অনাত্মীয়, এবং তাহাদের একীভূত জীবন হইতে স্বতন্ত্র? সেই দিন যখন তাহারা আপনাদের তরুণ দেহ পত্রাচ্ছাদনে আবৃত করিয়া আসিলেন তখন হইতেই সংসারে সৌন্দর্য্য ও সংযমের মিলিত পূজা আরম্ভ হইল না কি?

তাহাদের এতকালের নিশ্চিন্ত ও নিষ্কর্ম্ম জীবনের আলস্য ও নিশ্চলতা দূর করিয়া পরস্পরের পোষণ ও তোষণের জন্য যে চেষ্টা ও চিন্তার নবীন স্রোতঃ প্রবাহিত হইল, তাহা কি সেই হৃদয় দুইটিকে আর ও উর্ব্বরতর ও সুন্দরতর করিয়া লয় নাই?

দৈনিক পরিশ্রমের পর তাহাদিগের অপরাহ্নের অবসর কাল কি পরস্পরের সান্নিধ্য ও সাহচর্য্য জ্ঞানে পূর্ব্বাপেক্ষা মিষ্টতর হয় নাই? দুঃখ বিপদ যত ঘনাইয়া আসিয়াছে, সমবেদনাবোধ তাহাদের দাম্পত্য প্রেম কি ততই ঘনীভূত করে নাই? দেখ, স্বেদ-সিক্তদেহ আদম পত্নীর মধুর সম্ভাষণ ও পরিচর্য্যায় কি আরা

অনুভব করিতেছে, ভূমি-কর্ষণ ক্লেশ তাহার মনে নাই। আবার দেখ, নবজননী হবা সদ্যোজাত সন্তানকে বক্ষে লইয়া সকল দৈহিক বেদনা বিস্মৃত হইয়াছে।

পুরুষের পক্ষে স্ত্রীপুত্রের জন্য খাটিয়া মরা, এবং নারীর পক্ষে পতিপুত্রের পরিচর্য্যায় জীবনপাত করা বিধাতার অভিশাপ না আশীর্ব্বাদ? একলা নিজের জীবনটার জন্য জীবন দেওয়া অর্থহীন কথা। কাহারও জন্য মরিতেছি জানিলে মৃত্যুও মধুর লাগে। একটা 'জন্য'-বোধ জীবনে বড়ই আবশ্যক।

মানুষ শৈশবে পশুবৎ ছিল, ক্রমে জ্ঞান প্রভাবে তাহার মনুষ্যত্বের বিকাশ হইল; ক্রমে সে দেবতা হইতে চলিল। বাইবেল গ্রন্থের ঈশ্বর বলিতেছেন, "দেখ, এই মানুষ আমাদের (দেবতাদের) মত হইয়াছে, ভাল মন্দ বিচার করিতে পারে।"—'পাছে সে হাত বাড়াইয়া জীবন বৃক্ষের ফল আহরণ করে, ও উহা আস্বাদন করিয়া অমর হয় সেই ভয়ে ঈশ্বর তাহাকে ইডেন উদ্যান হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।'—জ্ঞান-তরু ও অমৃত-তরু কাছাকাছি ছিল, এখনও আছে। তবু, এত যুগ যুগান্তর পরেও লোকে জ্ঞানকে বিষতরু বলিতে ছাড়েনা।

বাইবেলের দেবতা মানুষের জ্ঞানার্জ্জনের প্রতিকূলে ছিলেন, নরসমাজে এক শ্রেণী অপর শ্রেণীর জ্ঞানের পথে কণ্টক রোপন করিয়াছে, জ্ঞান-পিপাসুকে দণ্ডিত ও লাঞ্ছিত করিয়াছে,—এবং আজিও করিতেছে। ইহার একমাত্র কারণ সেই আত্ম-প্রাধান্য লোপের অলীক আশঙ্কা—"পাছে আমাদের মত হয়।"

জগতের পুরোহিতকুল বহুকাল জ্ঞানাধার শাস্ত্র সকল আপনাদের একচেটিয়া করিয়া রাখিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহাদের সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা তাহাদের শাস্ত্র জ্ঞানের উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাই তাঁহারা ইতরজাতি ও নারীজাতির উপরে আপনাদের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রখিবার জন্য ইহাদিগকে সর্ব্বপ্রযত্নে জ্ঞানালোক হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছেন।

পুরুষের প্রভুত্বপ্রিয়তাই স্ত্রীলোকের জ্ঞানার্জ্জনের একমাত্র অন্তরায় না হইলেও মুখ্য অন্তরায়। আমরা দেখিতে পাই অনুশীলনের অভাবে শিক্ষা অনেক সময় ব্যর্থ হইয়া যায়। স্ত্রীজাতি জননী জাতি বলিয়া অধীত বিষয়ের অনুশীলনে তাহার অবসর পুরুষ হইতে অনেক কম। পত্নীত্ব ও জননীত্ব নারীর কর্ত্তব্য-ক্ষেত্র যেমন সীমাবদ্ধ করিয়াছে শিক্ষাকাল ও তদ্রূপ অল্প পরিসর করিয়াছে। নারী কি সে জন্য অসুখী? বর্ত্তমানে এক কথায় ইহার উত্তর সম্ভবে না। জগতের সংখ্যাতীত রমণী এবং বহুল পুরুষ জ্ঞানলাভে নিরুৎসুক, এমন কি একান্ত বিমুখ। কিন্তু পুরুষসাধারণের জন্য শিক্ষার যেরূপ ব্যবস্থা, নারীসাধারণের জন্য তদ্রূপ ব্যবস্থা নাই। সংসারে প্রবেশ করিয়া সকল পুরুষ জ্ঞানার্জ্জনে ব্যস্ত থাকে না, আপনাপন ব্যবসা এবং চাকরী লইয়াই অধিকাংশ সময় কাটায়। নারী আপনার গৃহকর্ম্ম ও গৃহধর্ম্মে ব্যস্ত থাকিবে বলিয়া পূর্ব্ব হইতেই তাহার শিক্ষার পথ রুদ্ধ। যে জন্মান্ধ সে আলোকের জন্য কাঁদে না। কিন্তু যে একবার আলোক দেখিয়া দর্শন সুখে বঞ্চিত আছে সে নিতান্তই দুঃখী। এরূপ দুঃখিনী নারীর সংখ্যা নিতান্ত বিরল নহে।

সমগ্র মানব জাতি জ্ঞানের আলোকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। বহু শতাব্দী পূর্ব্বে যে জ্ঞান সমাজের জ্ঞানি-জ্যেষ্ঠগণ বহু কষ্টে অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন বর্ত্তমানের মানুষেরা বাল্যকালেই সেই জ্ঞান উত্তরাধিকার সূত্রে ধনের মত, বিনা আয়াসে লাভ করিতেছে। নূতন জ্ঞান নূতন সুখ দুঃখ আশা ও আকাঙ্ক্ষা জাগাইতেছে, নব নব শক্তির উন্মেষ করিয়া দিতেছে। কিন্তু এই জ্ঞানালোকের মধ্যে বাস করিয়া এবং ভদ্রেতর সকল শ্রেণীর পুরুষের জন্য জ্ঞানের ও শিক্ষার আবশ্যকতা স্বীকার করিয়াও স্ত্রীজাতির শিক্ষা সম্বন্ধে এ দেশের লোক সম্পূর্ণ উদাসীন। তাহারা স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষা অতিশয় ভয় ও সন্দেহের চক্ষে দর্শন করেন। কেন? কেন? সেই এক বুলি—"পাছে ওরা আমাদের মত হয়।"

বলি, তাহাও কি সম্ভবপর? রমণি, জ্ঞানের আলোক তোমাকে কি এমনই অন্ধ করিবে যে, তুমি জননী ও ভগিনীর মধুর সৌন্দর্য্য উপেক্ষা করিয়া, তোমার পিতার

কাঠিন্য টুকুরই অনুকরণে একান্ত ব্যস্ত হইবে! জ্ঞান যদি শুভাশুভ, সুন্দর কুৎসিৎ, উপযোগিতা ও অনুপযোগিতার বিচার করিতেই না শিখাইল তবে তাহাকে জ্ঞান বলিবে কি? তুমি মাতার কোমল বাহু বেষ্টিত হইয়া তাঁহার বক্ষঃনিসৃত শুভ্র ক্ষীরধারা পান করিয়াছ এবং কালে স্বয়ং স্নেহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী জননীরূপে শিশুকে বক্ষে পোষণ করিবে, তুমি কিরূপে নারীত্ব হইতে ভ্রষ্ট হইবে আমি তো বুঝিতে পারি না। তুমি পার কি?

মনে করাই গেল যে নারী কোন কোন বিষয়ে 'আমাদের মত' হইল, তাহাতে 'আমাদের' ক্ষতি কি? পুরাণে দেখা যায় কোন মানব বা দানব দুশ্চর তপস্যায় রত হইলে, ইন্দ্রাদি দেবগণ ভীত হইয়া তাহার তপস্যায় বিঘ্ন জন্মাইতেন, পাছে সে ইন্দ্রত্বাদি কাড়িয়া লয়। 'আমাদের' সেরূপ কোন ভয় আছে কি?

পুরুষেরা নারীর হীনতা প্রমাণ করিতে গিয়া, কতকগুলি দোষের উল্লেখ করেন। যদি জ্ঞান ও শিক্ষা প্রভাবে নারীগণ সে সকল দোষ হইতে মুক্তিলাভ করেন, ভীরুতা বিমূঢ়তা ঘুচাইয়া, নির্ভীকতা ও স্থির-বুদ্ধি প্রকাশ করেন, অস্থির মতিত্ব দূর করিয়া স্থির-প্রতিজ্ঞ হন; অগ্রপশ্চাৎ ভাবিয়া কার্য্য করিয়া অদূরদর্শিতার অপবাদ হইতে নিষ্কৃতি পান; পক্ষপাতিত্ব পরিহার পূর্ব্বক অকম্পিত হস্তে ন্যায়ের তুলাদণ্ড ধারণ পূর্ব্বক দণ্ড পুরস্কার বিধান করিতে পারেন, তাহাতে সমাজের ইষ্ট কি অনিষ্ট? নারী যদি কল-চালিত পুত্তলিকার মত না হইয়া আপনার দায়িত্ব জ্ঞানে কর্ত্তব্য করিতে শেখেন, পূজার মন্ত্র পাখীর মত উচ্চারণ না করিয়া, তাহার অর্থ বুঝিতে সমর্থ হন; যদি কুসংস্কারের আবর্জ্জনারাশি সরাইয়া ফেলিয়া, কৌলিক আচার ও ব্রত নিয়মাদির প্রকৃত মর্ম্ম, কবিত্ব, সৌন্দর্য্য ও উপকারিতা অনুভব করেন, তাহা হইলে কি গৃহ কিম্বা পরিবারে কোন মহান্ অনর্থ ঘটে?

জ্ঞানের যাহা দুঃখ তাহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। ভালকে যদি ভাল বলিয়া জানা যায়, তবে যাহা মন্দ তাহা প্রাণে অশান্তি আনিবেই। জ্ঞানের সঙ্গে নূতন আকাঙ্ক্ষা জন্মে, নূতন আদর্শ আসিয়া সম্মুখে আহ্বান করে। আদর্শের অনুরূপ হইবার চেষ্টাতেই পুণ্য, বিপরীত হওয়াই পাপ। প্রত্যেক জ্ঞানের সঙ্গে একটা দায়িত্ব আসিয়া আমাদের নৈতিক জীবন অধিকার করে। সে হিসাবে জ্ঞানই দুঃখের আকর। কিন্তু পশু ও মানবে, জ্ঞানী ও অজ্ঞানীতে প্রভেদ এই দুঃখের ভেদেই।

অপর দিকে জ্ঞান ও আনন্দ নিত্য সম্বন্ধ। যেখানে জ্ঞান, সেখানে আলোক; ভ্রম, সংশয় ও ভয় তথায় তিষ্ঠিতে পারে না, অতএব সেখানে বিমল আনন্দ, সেখানে জীবন অর্থযুক্ত। নতুবা মানবজীবন কিছুই নহে, বৃথা ভার বহন মাত্র।

—

আদর্শ দাম্পত্য জীবন।

শরীর মন ও আত্মা এই তিন উপাদানে মানুষ গঠিত। সংসারে মানুষে মানুষে যত সম্বন্ধ তাহাতেও এই তিন উপাদানেরই ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। শারীরিক বৃত্তিতে মানুষ ও পশু সমান, মানসিক বৃত্তির অধিকারী হইয়া মানুষ পশুত্বের এক সোপান উপরে উঠিয়াছে, আধ্যাত্মিক বৃত্তির বিকাশেই তাহার চরম উন্নতি। কিন্তু সংসারে মানুষ সাধারণতঃ শরীর লইয়াই ব্যস্ত, মনের উন্নতি সাধনে অপেক্ষাকৃত অল্প লোক সচেষ্ট, আত্মার উন্নতি সাধনে যত্নপরায়ণ লোকের সংখ্যা আরো কম। পিতা মাতা ও সন্তান, ভ্রাতা ও ভগিনী, স্বামী ও স্ত্রী এই সকল সম্বন্ধের মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাবের বিকাশ সাধারণতঃ অল্পই দেখা যায়। আমরা আজ "ভারত মহিলা"র পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট দাম্পত্য জীবনের একটী দুর্লভ আদর্শ উপস্থিত করিতেছি। স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রাণ মহাত্মাগণের অন্তরঙ্গ বন্ধু শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র রায় ও তাঁহার পত্নী দেবী অঘোরকামিনী এই অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। দেবী অঘোরকামিনী এখন পরলোকে। ভক্ত প্রকাশচন্দ্র সশরীরে আমাদের মধ্যেই বাস করিতেছেন। তাঁহার সংসর্গে থাকিয়া আমরা দেখিতেছি তাঁহার আত্মা নিয়তই পত্নীসঙ্গে লোকাতীত

রাজ্যে বাস করিতেছে। পরমাত্মার সঙ্গে মানবাত্মার সম্বন্ধ যেমন সত্য, মানবাত্মার সঙ্গে মানবাত্মার প্রকৃত সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে তাহাও তেমনি সত্য ও স্থায়ী হয়। ভগবদ্ভক্ত প্রকাশচন্দ্র ও দেবী অঘোরকামিনীর মধ্যে সেই আত্মিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল, তাই ইহলোকে থাকিয়াও তিনি নিয়ত পত্নী-আত্মার সঙ্গ সম্ভোগ করিতেছেন। পত্নীর আত্মাকে সম্বোধন করিয়া প্রকাশচন্দ্র তাঁহাদের মিলিত জীবনের যে অপূর্ব্ব বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন. "ভারত মহিলা"র পাঠক-পাঠিকাগণকে আজ আমরা তাহার কিয়দংশ উপহার দিতেছি। পুস্তকখানি মুদ্রিত হইতেছে, প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই ভারত মহিলাতে তাহার আরো কয়েক পরিচ্ছেদ প্রকাশিত হইবে।*

শ্বশুর পরিবার।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই সময়ে দার্শনিক পুস্তক?সকল পড়িয়া আমার ধর্ম্মভাব শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। আমি নাস্তিক হইয়াছিলাম। যদি মনের ঐ গতি চিরস্থায়ী হইত, আমার এবং তোমার দশা কি হইত! কিন্তু ভগবান তাহা হইতে দিলেন না। বহরমপুরে তখন শ্রদ্ধাস্পদ এস জে হিল সাহেব পাদরী ছিলেন। তাঁহার সহিত আমার পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হইল। তিনি ও তাঁহার পত্নী আমাকে আপনার সন্তানের মত দেখিতেন। হিল্ সাহেবের নিকট বাইবেল পড়িতে লাগিলাম ও তাঁহার সাধু চরিত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলাম। ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে এবার বুঝিতে পারিলাম সাধু চরিত্র কাহাকে বলে। খ্রীষ্টকে ইনি জীবনে পাইয়াছিলেন; ভারতবাসীকে বড় ভাল বাসিতেন; এমন বাঙ্গালা বলিতেন মনে হইত ঠিক যেন একজন বাঙ্গালী কথা কহিতেছেন।

ইহার পর দুমাসের মধ্যে তোমাদের বাড়ীতে মহা-বিপদ উপস্থিত হইল। তোমার পিতার ভীষণ বসন্তরোগ হইল। তিনি পরলোকগত হইলেন। শোকের আবেগে প্রাঙ্গনে আসিয়া তুমি পিতার মৃতদেহ জড়াইয়া ধরিয়া-ছিলে। তাহাতে তোমারও বসন্ত হইল। ক্রমে তোমার ভগিনী যামিনী ও ভ্রাতা জ্ঞানেরও হইল। আমি সংবাদ পাইয়া দেখিতে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইলাম। কিন্তু সেজ দাদার অনুমতি না হওয়াতে যাইতে পারিলাম না। মনে বড়ই কষ্ট হইল। মনের কষ্ট মনেই রাখিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

তোমরা দুটী ভগিনী শীঘ্র নীরোগ হইলে, কিন্তু ভ্রাতা জ্ঞানকে লইয়া টানাটানি পড়িয়া গেল। জ্ঞানের সেবায় তোমাকে ব্যস্ত থাকিতে হইল। বিধবা মাতা অন্য সন্তানদের জন্য ব্যস্ত থাকিতেন। জ্ঞানের সমুদয় ভার তোমারই উপরে পড়িল। তখন তোমার বয়ঃক্রম ১০ বৎসর মাত্র। জ্ঞানকে লইয়া ভবানীপুরে তোমার মাতামহের বাটীতে আসিতে হইল। অনেক পরিশ্রম ও সেবার পর জ্ঞান বাঁচিলেন, কিন্তু একটী চক্ষু গেল।

বিবাহের কিছুকাল পরে তোমার চরিত্রের একটী সুলক্ষণ বুঝিতে পারিলাম। তুমি অল্প বয়সেই রন্ধনপটু বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলে। কর্ম্মের বাটীতে অনেক কর্ম্ম করিতে পার বলিয়া তোমার সুখ্যাতি বাহির হইয়া-ছিল। একদিন কোনও কর্ম্মোপলক্ষে পাড়ার কুটুম্বদের বাটীতে আহূত হইয়া গিয়াছিলে। রন্ধন শেষ হইয়া গেলে প্রাঙ্গণে নিমন্ত্রিত নারীরা কিরূপে সমাদর পাইতেছেন দেখিতে গেলে। আশ্চর্য্য ব্যবহার দেখিলে; যাঁহারা ভাল বস্ত্র, ভাল অলঙ্কার পরিধান করিয়া আসিতেছেন,

* ভক্তিভাজন স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় তাঁহার "স্ত্রীচরিত্র" নামক পুস্তকে "সাধ্বী অঘোর কামিনী" সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—"প্রকাশ-চন্দ্র ব্রাহ্মসমাজে একজন প্রধান ব্যক্তি, তাঁহার নিষ্ঠা, ভক্তি, সচ্চরিত্রতা সকলেই জানেন, তাঁহার অনেক ধর্ম্মবন্ধু আছেন, কিন্তু তাঁহার ভার্য্যার ন্যায় ধর্ম্মবন্ধু তিনি আর কাহাকেও কখন পান নাই। নিত্য ধর্ম্ম প্রসঙ্গে, ধর্ম্ম বিশ্বাসে, ধর্ম্ম সাধনে, ধর্ম্ম প্রচারে অঘোর কামিনীর অবিশ্রান্ত উৎসাহ। * * * তিনি ধর্ম্মাত্মা স্বামীর সঙ্গে নিগূঢ় ভক্তি, নিষ্ঠা ও উচ্চ ব্রত পালন করিয়াছেন। ঈশ্বরোপাসনায় অঘোরকামিনীর অসামান্য ভক্তি দেখিয়া আচার্য্য কেশবচন্দ্র অতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। * * * শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র রায় তাঁহাকে সহধর্ম্মিণী রূপে পাইয়া ধন্য হইয়াছিলেন, তিনি প্রকাশচন্দ্রকে পতিরূপে পাইয়া ধন্যা হইয়াছিলেন, এবং আমরা তাঁহাদের উভয়কে শ্রদ্ধা প্রীতি করিয়া সুখী হইয়াছি. উপকৃত হইয়াছি, কৃতার্থ হইয়াছি।"

তাঁহাদের যত্ন হইতেছে, আর যাঁহারা সামান্য বস্ত্রে এবং বিনা অলঙ্কারে আসিতেছেন, তাঁহাদের আদর হইতেছে না। আহারের সময়ও এই বিভিন্ন আচরণ দেখা গিয়াছিল। বালিকা তুমি, তোমার মনে অত্যন্ত আঘাত লাগিল। ধনের প্রতি এত সমাদর? এ কি অন্যায়! সেই দিনই তোমার সংকল্প হইল, তুমি যথাসাধ্য দুঃখীর সাহায্যতা করিবে।

কয়েক মাস পরে আমিও বহরমপুর ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিলাম। তখন হিল সাহেবের চরিত্রের ছবি আমার হৃদয়ে পড়িয়াছে। ঈশার ধর্ম্মে যে মানুষ ভাল হইতে পারে তাহা বুঝিয়াছি। কলিকাতায় আসিয়া খ্রীষ্টীয় ভ্রাতাদের সঙ্গে আলাপ ও ধর্ম্ম প্রসঙ্গ করিতে লাগিলাম। এ সময় আমি ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরোধী ছিলাম। যে ধর্ম্মে শাস্ত্র নাই সে ধর্ম্মে কিরূপে মুক্তি হইবে বুঝিতে পারিতাম না। স্বয়ং ঈশ্বরই যে শাস্ত্র এ কথা বুদ্ধির অগম্য ছিল। আর এক কারণ এই যে ব্রাহ্মদের মধ্যে যাঁহারা ভাল লোক তাঁহাদের কাহারও সঙ্গে পরিচয় হয় নাই। বহরমপুরের ব্রাহ্মধর্ম্মে আমার মন উঠে নাই। সেখানে একটি ব্রাহ্মসমাজ ছিল, কিন্তু তাহাতে গিয়া সুখ পাইতাম না। জীবনশূন্য ধর্ম্মে আমার মনকে আকৃষ্ট করিতে পারিত না। সুতরাং হিল সাহেবের জীবনগত ধর্ম্মের জন্য লালায়িত হইতে লাগিলাম। অনেক খ্রীষ্টীয় পুস্তক পড়িতে লাগিলাম। খ্রীষ্টান হইবার জন্য মন প্রস্তুত হইতে লাগিল। মানুষের পরিত্রাণ ভিন্ন চলে না, বুঝিলাম। একদিন রাত্রি ১১টার সময় পাঠ শেষ করিয়া বলিলাম, আগামী কল্য আমি খ্রীষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিত (baptised) হইব। আমার প্রকোষ্ঠে একজন বাল্যসখা শয়ন করিয়াছিলেন। তিনি কতই প্রবোধ দিলেন। তোমার সঙ্গে তখন নূতন বিবাহ হইয়াছে, তোমার কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। কিন্তু কিছুতেই মন মানিল না। পরিত্রাণ কিসে হইবে এই চিন্তা তখন আমার মনকে অধিকার করিয়াছে। তাঁহার সঙ্গে কথায় কথায় মনে পড়িল যে আমার প্রিয় শিক্ষা-গুরু শ্রদ্ধেয় ঈশান বাবু বলিতেন, কোন গুরুতর কার্য্য করিবার পূর্ব্বে ২৪ ঘণ্টা সময় লইও। আমি ২৪ ঘণ্টা অপেক্ষা করিতে স্বীকার করিলাম। এত দিন যদি গিয়াছে তো ২৪ ঘণ্টা অতিবাহিত হইলে আর কি হইবে? এক দিনের জন্য নিরস্ত হইলাম। সেই রাত্রে যদি খ্রীষ্টান হইতাম তাহা হইলে কি হইত জানি না। যাহাই হউক, আমার এ ভাব তাহা হইলে দেখিতে পাইতে না। তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিতে কি না, তাহাই বা কে জানে? সেই যে ২৪ ঘণ্টার সময় লইলাম তাহাতেই রক্ষা। পর দিন বৈকালে শুনিলাম একজন খ্রীষ্টান সমপাঠী প্রশ্নের কাগজ চুরি করিয়াছেন। পরীক্ষার দিনে রেজিষ্ট্রার সট্‌ক্লিফ্ সাহেব তাহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। আমাদের পরীক্ষা বন্ধ হইয়া গেল। পুনরায় পরীক্ষা লওয়া হইবে এই হুকুম হইল। যখন খ্রীষ্টান ভাইকে তাড়াইয়া দেওয়া হইল, আমার মন কেমন করিতে লাগিল। ভাবিলাম খ্রীষ্টান হইলেও চুরি করা হইতে রক্ষা পাওয়া যায় না; খৃষ্টান হইলেই তো নবজীবন লাভ হয় না। এই সকল চিন্তা করিয়া আমার খৃষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষা লওয়া হইল না।

ইহার পর ১৮৬৭ সালের গ্রীষ্মের ছুটীর সময় আমাদের গ্রামে তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইল। বিবাহের পর তোমার সঙ্গে আমার এই প্রথম সাক্ষাৎ। তখনও তোমার সঙ্গে ভাল করিয়া পরিচয় হয় নাই। তুমি একবারে একদিনে আমার হাতে আত্মসমর্পণ করিতে পার নাই। * * * *
যাহা হউক, এইবারেই তোমার সঙ্গে আমার আত্মীয়তার সঞ্চার হইতে আরম্ভ হইল। তুমি বুঝিতে লাগিলে যে আমি তোমার আপনার লোক। কিন্তু আমাদের একত্র থাকা অধিক দিন হইল না। সেজদাদার স্ত্রীর মৃত্যু হইল। পরিবারবর্গকে কলিকাতা হইতে দেশে পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

খৃষ্টান হইবার সঙ্কল্প ঘুচিয়া গিয়াছে কিন্তু অন্য কোনও ধর্ম্মে তখন পর্য্যন্তও মন বসিতেছে না। এই অবস্থায় ১৮৬৭ সালের শীতের ছুটীতে দেশে গেলাম। একদিন বাটীতে বসিয়া আছি, এমন সময় আমাদের গ্রামের কয়েকজন সঙ্গী আসিয়া আমাকে ডাকিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কলিকাতার

হেয়ার ও হিন্দু স্কুলের ভাবী শিক্ষক কেদার নাথ রায়, মিটিওরোলজিক্যাল্ অফিসের ভাবী প্রধান কেরাণী (পরে রাও সাহেব) ফণীন্দ্রমোহন বসু ও পটলডাঙ্গার কবিরাজ পঞ্চানন ঘোষ কবিরত্নও ছিলেন। ইঁহারা বলিলেন, যোগীন্দ্র চৌধুরীদের বাড়ীতে বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য সভা হইবে, তুমিও চল। নাস্তিক হইলেও এইরূপ সামাজিক বিষয়ে আমার পূর্ণ সহানুভূতি ছিল। সভার কাজ যাহা ছিল করিলাম, তারপর সকলে নদীতীরে বেড়াইতে গেলাম। তাহারই কিছুদিন পূর্ব্বে জ্যৈষ্ঠ মাসের ভারী ঝড় হইয়া গিয়াছে। হরি দত্ত মহাশয়ের বাটীর আটচালা পড়িয়া গিয়াছে। সকলেই সেই পড়া ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিলেন। আমিও দেখাদেখি প্রবেশ করিলাম। খান কতক তক্তপোষ ভিতরে ছিল, অন্ধকার ঘরে তক্তপোষের উপর সকলেই বসিলেন, আমিও বসিলাম। ব্রাহ্মসমাজের দু একটা গান হইল; আমার তত ভাল লাগিল না। তারপর সকলেই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে আমি বিদ্যালয়ে সকলের উচ্চ শ্রেণীতে পড়ি। আমার মনে অভিমান হইল, "ইহারা প্রার্থনা করিতে পারে, আমি পারি না?" আমিও প্রার্থনা করিলাম। আমি বলিলাম, "ঈশ্বর, তোমার নিকটে সকলে প্রার্থনা করিল, আমি তোমাকে চিনিও না, জানিও না, যদি তুমি থাক এবং তোমার ইচ্ছা হয় তো তোমাকে দেখিতে চিনিতে দাও।" এইরূপে অনিশ্চিত অজানিত অপরিচিত ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলাম। প্রার্থনার কারণ ছিল অভিমান,—সকলে প্রার্থনা করিবে, আমি করিব না? কিন্তু যেমন করিলাম অমনি ধরা পড়িলাম। সেইদিন হইতে ঐ প্রিয় বন্ধুদের সঙ্গ আমার মনকে আকৃষ্ট করিতে লাগিল।

ধর্ম্মবিষয়ে আমার মনে এইরূপ আন্দোলন চলিতেছিল। তোমার সঙ্গে তখনও এমন সম্বন্ধ হয় নাই যে তোমাকে আমার এ সকল সংগ্রামের অংশ দি। অপর দিকে তুমি তখন নূতন বধূ; তোমার সম্বন্ধে তখনও আমার বিশেষ কোন অধিকার ছিল না। একান্নবর্ত্তী পরিবারে যদি প্রেমের রাজত্ব না থাকে তাহা হইলে যে দশা হয়, আমাদের বাড়ীর দশাও তাহাই ছিল। যে যাহার লইয়াই ব্যস্ত; লাভের মধ্যে একত্র থাকাতে পরস্পরের সম্বন্ধে দাবী ও অভিযোগের ভাব অনেক সময় প্রকাশ পাইত। এরূপ পরিবারে নূতন অসহায়া বালিকা আসিয়া সহজে কাহাকেও আপনার বলিয়া ধরিতে পারে না। তোমার দশাও তাহাই হইল।

এই সময়ে আমাদের পারিবারিক দুরবস্থা আরও বর্দ্ধিত হইল। তোমাকেও তাহার ফল ভোগ করিতে হইল। বিষয় লইয়া বড়দাদা ও সেজদাদার মধ্যে কলহ আরম্ভ হইল। আমি মাঝে থাকিয়া অনেক চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কলহ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেই লাগিল। আদালতে সাব্যস্ত হইল, বিষয়ে সকল ভ্রাতারই অধিকার আছে। কিন্তু বিচারালয়ে নির্দ্ধারিত হইলে কি হইবে? ইচ্ছা যখন হয়, তখন বিষয় নষ্ট করিতে কতদিন লাগে? দেখিতে দেখিতে অমন সুন্দর তালুক নষ্ট হইতে লাগিল। রক্ষার জন্য আমি সাধ্যমত চেষ্টা করিলাম, তাহাতে আমার পাঠের অনেক ক্ষতি হইল। কিছুতেই কিছু হইল না। আমার চক্ষের সম্মুখে ৬০।৭০ হাজার টাকার বিষয় পাঁচ হাজার টাকায় দেন-ডিক্রিতে বিক্রয় হইয়া গেল। তখন হায় হায় মাত্র বাকি রহিল। যাহা হউক, নশ্বর সম্পত্তি গিয়া আমার মঙ্গল হইল। থাকিলে হয় তো ঈশ্বরের দিকে মন আর অধিক আকৃষ্ট হইত না।

সম্পত্তি গেল; বাড়ীর অবস্থা খারাপ হইল। তোমাদের খাটুনি বাড়িল। আর তুমি তখনও বধূর উপযুক্ত ব্যবহার সব ভাল করিয়া শিক্ষা কর নাই। তাই বাড়ীতে অনেক গঞ্জনাও সহ্য করিতে হইত। মোকদ্দমার গোলমালে আমারও পড়া শুনা প্রায় ঘুচিয়া গেল।

সেজ দাদা দ্বিতীয়বার বিবাহ করিলেন। ছোট বউটী একলা বিদেশে কেমন করিয়া থাকিবেন, তাই সমুদয় পরিবার কলিকাতায় আনা স্থির হইল। সেজ দাদার সুবিধায় আমারও সুবিধা হইল। আবার তোমার সহিত একত্র থাকিতে পাইলাম। কিন্তু এ বাড়ীতেও আমার কোন মর্য্যাদা নাই, কারণ পড়াশুনা প্রায় ঘুচিয়াছে, কাজ কর্ম্ম আরম্ভ করি নাই; কাজেই তোমারও

কিছু মর্য্যাদা ছিল না। এখানেও তোমার সম্বন্ধে আমার কোন ক্ষমতা ছিল না। সারাদিন তোমাকে রন্ধন প্রভৃতিতে নিযুক্ত থাকিতে হইত। কি আহার করিলে তাহাও আমি সব সময় জানিতে পাইতাম না। আমার ইচ্ছা হইত তোমাকে লেখাপড়া শিখাই। দিনে তাহার সুযোগ হইত না। সকলে শয়ন করিলে, যখন তুমি শয়ন করিতে আসিতে, তখন তোমার বিদ্যা শিক্ষা আরম্ভ হইত। আমি গুরু হইয়া স্বতন্ত্র বসিতাম, তুমি ছাত্রী হইয়া ভয়ে ভয়ে দূরে বসিতে। অনুরাগের সহিত আপনার পাঠ শিখিতে। এইরূপে তোমার ক, খ, আরম্ভ হইল, ক্রমে প্রথম ভাগ দ্বিতীয় ভাগ শেষ হইয়া গেল।

কিছুকাল পরে তুমি দেশে চলিয়া গেলে, আমি কলিকাতায় রহিলাম। তোমার সংবাদটী কিন্তু প্রয়োজন। খামে নিজের ঠিকানা লিখিয়া পত্রের মধ্যে করিয়া পাঠাইয়া দিতাম। এ খরচ কোথা হইতে জুটিত? ছেলে পড়াইতাম। কখনও ১০৲ টাকা, কখনও ১৫৲ টাকা পাইতাম। বিদ্যালয়ের বেতনাদি উহাতেই চলিত, বাকি যাহা কিছু থাকিত তাহা হইতে তোমাকে মাসে মাসে ৫টী টাকা পাঠাইয়া আপনাকে সুখী মনে করিতাম। পাঠের সময় বিবাহ হইলে কি দশা হয় তাহা আমি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলাম। তোমার কথা সদাই মনে হইত। পড়িতেছি, পড়িতেছি, হঠাৎ মনে তোমার একটা কথা উদয় হইল, আর পাঠ বন্ধ হইল। অনেকক্ষণ ধরিয়া চিন্তাই করিতে লাগিলাম। বই খোলাই পড়িয়া রহিল। বিশেষতঃ তোমার শ্বশুরালয়ের জীবন এসময় বিশেষ সুখের জীবন ছিল না। তাই আমাকে অনেক সময় তোমার জন্য চিন্তিত হইতে হইত। এইরূপে আমার কত সময়ই নষ্ট হইত, তাহার ঠিক নাই। এই সময় আমি বি এ পড়িতেছিলাম। মোকদ্দমার পরেও সেজ দাদা আমাকে অন্যান্য অনেক রকম কাযে নিযুক্ত করিতেন। সুতরাং আমি আর বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলাম না।

আমরা পথে পথে যাব।*

আমরা পথে পথে যাব সা'রে সা'রে,
তোমার নাম গেয়ে ফিরিব দ্বারে দ্বারে।

আমরা বল্‌ব জননীরে কি দিবি দান,
কে দিবি ধন তোরা, কে দিবি প্রাণ,
মা ডেকেছে ক'ব বারে বারে।

তোমার নামে প্রাণের সকল সুর,
আপনি উঠ্‌বে বে'জে সুধা মধুর—
হৃদয় যন্ত্রেরি তারে তারে।

বেলা গেলে তখন তোমারি পায়ে
এনে দেব সবার পূজা কুড়ায়ে
সন্তানেরি দান ভারে ভারে।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

শান্তি—সার্দ্ধ সম্বৎসর কাল বসুন্ধরার মাতৃবক্ষঃ সন্তান রক্তে সিক্ত করিয়া রুষ-জাপানের মহাসংগ্রামের অবসান হইয়াছে। আমেরিকার দেশপতি মহাত্মা রুজ-বেল্টের চেষ্টায় যোদ্ধৃজাতি-দ্বয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইয়াছে। জাপান আপন অভীষ্ট লাভ করিয়াছে। কোরিয়া রাজ্যে জাপানের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, পোর্ট আর্থার ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহ জাপানের হস্তগত হইয়াছে এবং রুষ চীনরাজ্য মাঞ্চুরিয়া পরিত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ফল অপেক্ষা পরোক্ষ ফল অধিকতর কল্যাণকর হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এশিয়াবাসী ইউরোপবাসীর সমকক্ষ হইতে পারে না এ ধারণা এতদিন সকলের মনে বদ্ধমূল ছিল, জাপান সেই ধারণা পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছে। সুপ্তপ্রায় বিশাল চীন সাম্রাজ্যে ইতি মধ্যেই উত্থানের চিহ্ন দেখা যাইতেছে। চীনের শিক্ষিত যুবকগণ দেশের উন্নতি সাধন

* এই সঙ্গীতটির স্বরলিপি আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।
ভাঃ মঃ সঃ।

বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভের জন্য দলে দলে জাপান ও ইউরোপে যাইতে আরম্ভ করিয়াছে। চীনের সৈন্যদল সুগঠিত ও বহুসংখ্যক যুদ্ধজাহাজ নির্ম্মাণের আয়োজন হইতেছে। আশা করা যায় অচিরে চীন জগতে এক মহা শক্তিশালী সাম্রাজ্যে পরিণত হইবে। এশিয়ার অন্যান্য দেশেও জাগরণের চেষ্টা লক্ষিত হইতেছে।

লর্ড কার্জ্জনের পদত্যাগ—কিছুদিন পূর্ব্বে সৈন্য বিভাগের পুনর্গঠন সম্বন্ধে প্রধান সেনাপতি লর্ড কিচেনারের সহিত গবর্ণর জেনারেলের মতভেদ উপস্থিত হইয়াছিল। বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষ সেনাপতির পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। অবশেষে উক্ত বিভাগের একজন প্রধান কর্ম্মচারীর পদে লর্ড কার্জ্জনের মনোনীত ব্যক্তিকে নিয়োগ করিতে কর্ত্তৃপক্ষ অসম্মত হওয়াতে তিনি পদত্যাগ করিয়াছেন। লর্ড কার্জ্জন অতি শক্তিশালী শাসনকর্ত্তা ছিলেন; কিন্তু ভারতবাসী তাঁহার শাসন কার্য্যে সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ ব্যাপারে এই অসন্তোষ অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছে।

নব নিয়োজিত রাজ-প্রতিনিধি—লর্ড মিণ্টো আমাদের নূতন গবর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হইয়াছেন। আগামী নবেম্বর মাসে তিনি সস্ত্রীক এদেশে আগমন করিবেন। ইঁহার পিতামহ এক সময়ে ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তা ছিলেন, ইনিও ইতিপূর্ব্বে ক্যানেডার প্রধান শাসনকর্ত্তা রূপে সুযশ অর্জ্জন করিয়াছেন, সুতরাং আশা করা যায়, ভারতবর্ষেও প্রজারঞ্জন করিতে সমর্থ হইবেন। আমাদের নূতন লাটপত্নীও অতি সদাশয়া রমণী।

কুমারী ম্যানিং—সম্প্রতি ভারত-হিতৈষিণী কুমারী ম্যানিং পরলোক গমন করিয়াছেন। আমরা "ভারত-মহিলাতে" ইঁহার জীবনী প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

স্বদেশী দ্রব্য ও বঙ্গনারী—বঙ্গব্যবচ্ছেদ আন্দোলনে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার সম্বন্ধে দেশের লোকের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে। অত্যন্ত সুখের বিষয় যে, নারীগণও এই সময়ে আপন কর্ত্তব্য বিস্মৃত হন নাই। নারীদিগের মধ্যে অনেকে রাজনৈতিক আন্দোলন বুঝিতে না পারেন, কিন্তু স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিয়া দেশের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করা যে অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। এবিষয়ে পুরুষ অপেক্ষা নারীর দায়িত্ব বরং বেশী। কারণ সাধারণতঃ স্ত্রীলোকদিগের পছন্দ অনুসারেই প্রত্যেক পরিবারে ব্যবহার্য্য দ্রব্য ক্রয় করা হয়, তাঁহাদের উৎসাহ ও সহানুভূতি না পাইলে পুরুষগণ স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের সংকল্প বড় বেশী দিন রক্ষা করিতে পারিবেন না। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে মহিলাগণ আপনাদিগের দায়িত্ব বুঝিতে পারিয়াছেন। বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন সহরে মহিলাগণ সমবেত হইয়া এবিষয়ে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতেছেন। গত ৫ই আশ্বিন নাটোরের মহারাণী শ্রীমতী গিরিবালা দেবীর আহ্বানে মেরি কার্পেণ্টার হলে কলিকাতার মহিলাদিগের এক বিরাট সভা হইয়াছিল। প্রায় এক হাজার মহিলা উপস্থিত হইয়াছিলেন। অসুস্থতা বশতঃ নাটোরের মহারাণী উপস্থিত হইতে পারেন নাই। শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী বি, এ, মহারাণীর লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন। সভাস্থলে চারিটী প্রবন্ধ পাঠ ও উদ্দীপনাপূর্ণ কবিতা আবৃত্তি এবং জাতীয় সঙ্গীত হইয়াছিল। কলিকাতায় মহিলাগণের এইরূপ মহাসম্মিলন বোধ হয় এই প্রথম; এই অনুষ্ঠানের জন্য নাটোরের মহারাণী ও অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসুর পত্নী শ্রীমতী অবলা বসু প্রভৃতি মহিলাগণ আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্রী। সভায় কোন মুসলমান মহিলা উপস্থিত হন নাই দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইয়াছি। আশাকরি উদ্যোগ কর্ত্রীগণের চেষ্টায় বর্ত্তমান সূচনা একটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর স্থায়ী অনুষ্ঠানে পরিণত হইবে ও এদেশের নারীশক্তির বিকাশ সাধনে প্রচুর সাহায্য করিবে।

২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত।

BENGAL LIBRARY 23 JAN 1906

৪৯
BL 53
18th 906.
BL 553
4
BENGAL LIBRARY 19 MAR 1906

ভারত-মহিলা

The woman's cause is man's ; they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free ;
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall men grow ?

Tennyson.

১ম ভাগ। | কার্ত্তিক, ১৩১২। | ৩য় সংখ্যা।

নেপালের স্বর্গীয়া বড় মহারাণী।

(মহারাজ চন্দ্র সামসের জঙ্গ রাণা বাহাদুরের পত্নী)

হিমালয় যে পয়োধি-বেষ্টিত বিপুল দেশের শিরোভূষণ তাহা জগতে হিন্দুস্থা" বলিয়া বিখ্যাত। এই হিন্দুস্থানবাসী হিন্দুদিগের সহিত পৃথিবীর আর কোন জাতিরই সাদৃশ্য কিম্বা জ্ঞাতি-বন্ধন নাই। দুর্ভেদ্য নৈসর্গিক পরিখা ও প্রাকারে বেষ্টিত করিয়া বিধাতা যেন ইহাকে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্ব বিষয়ে স্বতন্ত্র এবং চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছেন। এই জাতির প্রাচীন ইতিহাস এবং মহত্ত্ব জগতে সর্ব্বজন বিদিত, এস্থলে তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। সেই আদিম সুসভ্য পরাক্রান্ত স্বাধীন হিন্দুজাতি আজ পরপদ-দলিত ও হীনবীর্য্য বলিয়া বর্ত্তমান সুসভ্য জাতি সকলের কৃপাপাত্র হইয়াছে। হিমালয়ের ক্রোড়স্থ দুর্ভেদ্য নৈসর্গিক প্রাকার বেষ্টিত রাজ্য সকলও ক্রমে ক্রমে স্বাধীনতা হারাইয়াছে। কেবল দুইটী মাত্র রাজ্য এখনও পর্য্যন্ত স্বাধীনতার গৌরবময় উজ্জ্বল টীকা ললাটে ধারণ করিতেছে। তন্মধ্যে নেপাল প্রধান। ইহা হিমালয়ের ক্রোড়স্থ বিস্তীর্ণ প্রদেশ, প্রকৃতির রম্য কানন, বিবিধ নৈসর্গিক শোভা এবং সম্পদে ভাগ্যবান্। ইহার উত্তরে চির-তুষারাবৃত হিমালয়ের শিখর-মালা, চরণে গভীর শ্বাপদ সঙ্কুল অরণ্যানী। হিমাচল নরের অগম্য, পুরাণে ইহা দেবের আবাস স্থান বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। বিধাতা নেপাল রাজ্যকে দুর্ভেদ্য প্রাচীরে বেষ্টিত করিয়াছেন, তাই ইহা আজও স্বাধীন। জগতবাসীর কথা দূরে থাকুক, এদেশ ভারতবাসীরও অজ্ঞাত। এরাজ্য অতি বিচিত্র, ইহার প্রাচীন ইতিহাস অপূর্ব্ব উপন্যাসের ন্যায়। এই লুক্কায়িত স্থানে অনেক প্রাচীন কীর্ত্তি, অনেক প্রাচীন কথা গুপ্ত আছে। সুদূর চীন হইতে কোন্ যুগে কোন্ বোধি-সত্ত্ব মহাত্মা আসিয়া কোন্ বিপুল হ্রদকে রমণীয় উপত্যকায় পরিণত করিয়াছিলেন, কোথায় সেই হ্রদের মধ্যে শতদল শোভা পাইল, শতদলের নিম্নে পবিত্র বারি উৎসারিত হইল, সেখানে স্বয়ম্ভু ভগবান দিব্য কিরণে প্রভাসিত হইলেন, অদ্যাবধি নেপালবাসী ও নানাস্থান হইতে ভক্তবৃন্দ আসিয়া তথায়

পশুপতিনাথকে দর্শন করেন। কোথায় কোন দেবতার হস্তস্পর্শে দৈব বারিধারা উৎসারিত হইয়া নির্ঝরিণী সৃষ্টি করিয়াছে—কি অপূর্ব্ব কথা সে সকল! যুগে যুগে কত মহাপ্রাণ হিন্দু মুসলমানদিগের ভয়ে ভীত ও সংক্ষুব্ধ হইয়া এই দুর্ভেদ্য দুর্গে আশ্রয় লইয়াছিলেন। হিন্দুস্থান হইতে হিন্দুধর্ম্ম অত্যাচারিত হইয়া এখানে আসিয়া আশ্রয় লাভ করিয়াছে। ভারত বৌদ্ধ ধর্ম্ম এবং হিন্দুধর্ম্মের জন্ম স্থান, এই উভয় ধর্ম্মই নেপালে আশ্রয় লাভ করিয়াছে।

এই বিস্তীর্ণ রাজ্যের ভাগ্যচক্র ইঁহার প্রধান মন্ত্রীই নিয়মিত করিয়া থাকেন। এক সময়ে মারাঠা প্রধান মন্ত্রী পেশোয়াগণ যেরূপ ক্ষমতা ধারণ করিতেন, বর্ত্তমান নেপাল রাজমন্ত্রীদিগের ঠিক সেই গৌরব এবং সেইরূপ ক্ষমতা। রাজমন্ত্রী চন্দ্র সামসের জঙ্গ রাণা বাহাদুর বর্ত্তমান সময়ে নেপালের ভাগ্য চক্র বিবর্ত্তন করিতেছেন। এই পদে গৌরব এবং দায়িত্ব অনেক। পার্থিব দিক হইতে ইনি অতি ভাগ্যবান্ ক্ষণজন্মা পুরুষ সন্দেহ নাই, কিন্তু সুলভ হইলে ও একদিকে দুর্লভ গার্হস্থ্য সৌভাগ্যে ইনি ভাগ্যবান্। বিধাতা ইঁহাকে অশেষ গুণসম্পন্না লক্ষ্মীস্বরূপিণী ভাগ্যবতী পত্নীদানে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। যদিও ইনি অসময়ে তাঁহাকে হারাইয়াছেন তথাপি তিনি যে সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন তাহা কে অস্বীকার করিবে? ভারতেশ্বরী স্বর্গীয়া সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার অমৃতময় দাম্পত্য জীবনের বর্ণনা করিতে করিতে লেখক এক স্থলে বলিয়াছেন এরূপ গুণ-সম্পন্না পত্নী দীন দরিদ্র লাভ করিলেও ভাগ্যবান্ হয়, ভিক্টোরিয়াপতি এলবার্ট কি ভাগ্যবান্ পুরুষ যে এমন পত্নীরত্ন তিনি লাভ করিয়াছিলেন। আমরা মহারাজ চন্দ্র সামসের রাণা বাহাদুরের গুণবতী পত্নীরত্ন সম্বন্ধেও সেই কথা বলিতে পারি। এরূপ পতিপ্রাণা সাধ্বী নারী দরিদ্রের কুটীরে অতুল শোভা বিস্তার করে, রাজ গৃহে কি কথা? এই মহীয়সী সৌভাগ্যশালিনী অশেষ-গুণসম্পন্না মহিলার জীবন রমণীকুলের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিয়া আমরা সাধারণের নিকট এই মোহন চিত্র উপস্থিত করিতেছি। হিন্দুরমণীর ধমণীতে আজও সীতা সাবিত্রীর পবিত্র শোণিত কিরূপ প্রবাহিত হইতেছে তাহা পাঠকপাঠিকা একবার দর্শন করুন।

মহারাজ চন্দ্র সামসের রাণা বাহাদুর সুবিখ্যাত জঙ্গ রাণা বাহাদুরের ভ্রাতুষ্পুত্র,—তিব্বতের যুদ্ধে প্রসিদ্ধ বীর ধীর সামসেরের পুত্র। বর্ত্তমান সময়ে এই রাণা বংশই নেপালের সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছেন। আমরা যাঁহার কথা বলিতে যাইতেছি তিনি মহারাজ চন্দ্র সামসের রাণা বাহাদুরের একমাত্র মহিষী ছিলেন। নেপালে বহু পত্নী গ্রহণের রীতি প্রচলিত আছে কিন্তু মহারাজ চন্দ্র সামসের রাণা বাহাদুর বোধ হয় ইহার একমাত্র ব্যতিক্রম স্থল। তাঁহার গুণবতী পত্নী সম্পূর্ণরূপে তাঁহার পতির হৃদয় অধিকার করিয়াছিলেন। যে দিন তাঁহাকে সমুদয় নেপালের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ভাগ্যবতী রমণী বলিয়া দর্শন করিতে যাই সে দিন তাঁহার মুখেই শুনিয়াছি—"আমি সমুদয় নেপালের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সৌভাগ্যবতী রমণী সন্দেহ নাই, কারণ বিধাতা যে আমাকে শুধু এমন পতি দিয়াছেন তাহা নহে, আমি আমার পতির একমাত্র মহিষী,—এ সৌভাগ্য আমার অন্য স্বদেশীয় ভগিনীগণের নাই,—কন্যা অপেক্ষা পুত্রেরই এদেশে অধিক সমাদর, বিধাতা আমাকে পাঁচটী পুত্র ও একটী মাত্র কন্যা দিয়াছেন। শোক তাপ আমি কিছুই পাই নাই, দেহ ভগ্ন হইয়াছে বটে কিন্তু সম্পূর্ণ সুখ বিধাতা নরভাগ্যে রাখেন নাই, আমি ইহাতেই অত্যন্ত সুখী।"—কি সুন্দর কথা! কেমন পূর্ণ সন্তোষ!

এই ভাগ্যবতী রমণী কাঠমুণ্ড সহরের ১৩০ ক্রোশ দূরে পুটান নামক স্থানে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ১০ই মার্চ্চ রবিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি অতি সদ্বংশ-জাতা, শৈশবেই ইঁহার বিবাহ হয়। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ৩১শে জুলাই ইঁহার প্রথমা কন্যা বজঙ্গী মহারাণী ভূমিষ্ঠা হন। জ্যেষ্ঠ পুত্র মোহন সামসের জঙ্গ রাণা বাহাদুর ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ২৩শে ডিসেম্বর শনিবার ভূমিষ্ঠ হন। তৎপরে ক্রমে তাঁহার আরও চারিটী পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে

কনিষ্ঠ পুত্রের জন্মের পর হইতেই তিনি নিদারুণ যক্ষ্মা রোগে শয্যাগত হন এবং প্রায় তিন বৎসর ধীরতা এবং সহিষ্ণুতার সহিত অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া বিগত ১লা ফাল্গুন দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। হিন্দু রমণীর জীবনে বর্ণনীয় বিশেষ ঘটনা প্রায় থাকে না, ইঁহার জীবনেও উল্লেখযোগ্য বিশেষ ঘটনা তেমন কিছু নাই। ইনি অতি ধর্ম্মপ্রাণা, নিষ্ঠাবতী স্ত্রীলোক ছিলেন। রাজ-পতির সমভিব্যাহারে হরিদ্বার, বদরিকা, মথুরা, কুরুক্ষেত্র, প্রয়াগ প্রভৃতি বহু তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। অনেক যাগ যজ্ঞ, লক্ষ-হোম, কোটী-হোম প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। দৈনিক জীবনে অতি নিষ্ঠার সহিত ধর্ম্মাচরণ করিতেন। রোগ-শয্যায় পড়িয়াও এক দিনের তরে তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত প্রত্যুষে চারিটার সময় উঠিয়া, প্রাতঃকৃত্য ও পূজা সমাপন করিয়া তবে ঔষধ সেবন করিতেন।

মহারাণী সকল বিষয়ে আদর্শ পত্নী ছিলেন। তিনি কিরূপ প্রাণ মন দিয়া একান্ত চিত্তে পতির হিতসাধন ও সেবা শুশ্রূষা করিতেন যাঁহারা তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাঁহারাই মুগ্ধ হইয়াছেন। এদেশের রমণীগণ স্বামীর পাদোদক পান না করিয়া জলগ্রহণ করেন না, তাহাত তাঁহার নিত্যকর্ম্ম ছিল। যতদিন তাঁহার স্বাস্থ্য ছিল, ততদিন নিয়ত স্বামীর সেবা করিয়াছেন। রোগ-শয্যায় পড়িয়াও তিনি যে ভাবে স্বামীর সেবা শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিতেন, তাহা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। তাঁহার আহার নিদ্রার কোন অনিয়ম ও কোন ব্যাঘাত যাহাতে না হয় সর্ব্বদা সে বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন। স্বামী যথাসময়ে নিদ্রিত হইয়াছেন কিনা দাসীকে পাঠাইয়া তাহার তত্ত্ব লইতেন। অসুস্থ শরীরে শুইয়াও স্বামীর আহারের তত্ত্বাবধান করিতেন। পতির আরাম, পতির কল্যাণ তাঁহার হৃদয়ের নিত্য-চিন্তার বিষয় ছিল। হিন্দু রমণী সাধারণতঃ পতিপ্রাণা, কিন্তু তিনি এ সম্বন্ধে পরাকাষ্ঠা দেখাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

মহারাণী যেরূপ সাধ্বী ও পতিপ্রাণা ছিলেন, তাঁহার সুযোগ্য রাজপতিও তেমনি সর্ব্বতোভাবে তাঁহার প্রেমের গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি পত্নীর জন্য যাহা করিয়াছেন, সেরূপ দৃষ্টান্তও অতি বিরল। বিধাতা তাঁহার গুণবতী পত্নীকে অতি উচ্চ প্রকৃতি ও প্রখর মেধা দিয়া এজগতে পাঠাইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু মহারাজ তাঁহাকে যত্নপূর্ব্বক সুশিক্ষা দিয়া তাঁহার প্রকৃতি ও চরিত্রের সৌন্দর্য্য আরো ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন। মহারাজ তিন বৎসর কাল যেরূপ ভাবে মহারাণীর সেবা এবং চিকিৎসা করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার পত্নীর প্রতি গভীর প্রেম সুন্দররূপে প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি পত্নীর জন্য এই দীর্ঘকাল সকল প্রকার সুখ হইতে বঞ্চিত হইয়া নিয়ত মানসিক দুশ্চিন্তায় কালযাপন করিতেন। দুরারোগ্য ব্যাধি তাঁহার কোমল দেহকে ক্ষীণ করিতেছে দেখিয়া মহারাজ আকুল হইয়া পড়িতেন। মানবের সাধ্যে যাহা কিছু আছে পত্নীর জীবনের জন্য তাহার কিছুই অচেষ্টিত রাখেন নাই। যেদিন মহারাণীর রোগের কোনরূপ বৃদ্ধি হইত, চিকিৎসকদিগের প্রাণ ভয়ে শুক হইয়া যাইত,—মহারাজ হয়ত ভাবিবেন কোন ত্রুটী, কোন অনিয়ম হইয়াছে। স্ত্রীর রোগ-যন্ত্রণা ও শীর্ণ দেহলতা দেখিয়া মহারাজ শোকে কাতর হইতেন। যে প্রাণ বিশাল রাজ্যের ভার বহন করিতে পারে, যাহা বিপদে অচল অটল, তাহা পত্নীর রোগশয্যা পার্শ্বে স্থির থাকিতে পারিত না।

ইঁহাদের দাম্পত্য জীবন অত্যন্ত সুখের ছিল, উভয়ের প্রতি উভয়ের গভীর প্রেম ছিল। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছাকে প্রতিহত করিতে পারে? এই সুদৃঢ় প্রেমের বন্ধন ছিন্ন করিয়া মৃত্যু রাজ ভবন শোকে আচ্ছন্ন করিল, মহারাজের সুখের সংসার অকালে অন্ধকার হইল। মৃত্যুর তিন দিন পূর্ব্বে তাঁহাকে পশুপতিনাথে লইয়া যাওয়া হয়। যেদিন তাঁহার মহাযাত্রা সেদিন রাত্রি ১০টায় সময় মহারাজকে অনুরোধ করিয়া গৃহে পাঠাইলেন, রাত্রি ১২টার সময় তাঁহার শেষ সময় উপস্থিত হইল। ভগিনীকে পতির প্রতিকৃতি আনিতে অনুরোধ করিলেন, একবার একদৃষ্টে তাহা নিরীক্ষণ করিয়া মস্তকে ধারণ করিলেন, তারপর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ইষ্টদেবতাকে স্মরণ

করিতে করিতে এই নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া গেলেন। চিতাভস্ম বাঘমতীর জলে মিশ্রিত হইল, ধীর গম্ভীর নিনাদে কামানধ্বনি এই নিদারুণ বার্ত্তা সহরবাসীকে জ্ঞাপন করিল, কত চক্ষে সেদিন বারিধারা বর্ষিত হইল কে গণনা করে?

একটী ঘটনা বলিলে নারীগণ মহারাণীর পতিভক্তি বুঝিতে পারিবেন। মৃত্যুর পূর্ব্ব হইতেই মহারাণী পতিকে বিবাহ করিবার জন্য বার বার অনুরোধ করেন। "আপনি বিবাহ করুন, আমি চক্ষে তাহাকে দেখিয়া যাই, আমি তাহাকে আপনার সেবার সকল ব্যবস্থা শিখাইয়া দিয়া যাই। আমি সকল বন্দোবস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত মনে চলিয়া যাই।" শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি বার বার পতিকে বিবাহ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। "আপনি যদি আমার জন্য শোকার্ত্ত হৃদয়ে কালযাপন করেন, আমার আত্মা নরকগামী হইবে, আমি পরকালের সুখে বঞ্চিত হইব। ইহকালে আপনাকে অনেক কষ্ট দিলাম, মৃত্যুর পরে যেন আর কষ্ট না দিই।" এ উক্তি নারীর পক্ষে কি কঠিন, কত গভীর প্রেম হৃদয়ে থাকিলে পত্নী পতিকে এরূপ অনুরোধ করিতে পারেন? কত স্ত্রীলোক সপত্নী ভয়ে কাতর হইয়া মৃত্যু শয্যায় পতিকে আবার বিবাহ করিতে নিষেধ করে। কয় জন নারী আছেন যে প্রাণ খুলিয়া স্বামীকে এইরূপ অনুরোধ করিতে পারেন? মৃত্যুর পূর্ব্বে একদিন তিনি কন্যাকে বলিয়াছিলেন "আমি তোমার পিতাকে কেবল কষ্টই দিলাম। যদি তোমার পিতা আবার বিবাহ করেন তাঁহাকে সম্মান করিও, আদর করিও, তিনি তোমার গুণবতী মাতা হইবেন, তিনি তোমাদের শূন্য গৃহ পূর্ণ করিবেন, তোমার শোকার্ত্ত পিতার অন্তরে শান্তি দিবেন।"—আমরা কখন শুনি নাই কোন মাতা এরূপ ভাবে কন্যাকে কখনো উপদেশ দিয়াছেন।

মহারাণী আদর্শ মাতা ছিলেন, সন্তানদিগের সুশিক্ষার প্রতি নিয়ত দৃষ্টি রাখিতেন। একদিন শিশু পুত্রটী কি অন্যায় করিয়াছিল, তিনি শুনিয়া চক্ষের জলে ভাসিয়া বলিয়াছিলেন "আমি কি পাপিনী, আমার গর্ভের সন্তান কেন এরূপ করিল?" শিশুর অপরাধ সকলেই তুচ্ছ করে কিন্তু তাঁহার নিকট শিশুর অপরাধও গুরুতর বোধ হইত। সন্তানেরা তাঁহাকে যেমন শ্রদ্ধা ভক্তি করিত তেমনি ভয় করিত, এমনি তাঁহার সুদৃঢ় শাসন ছিল। এই চরিত্রবতী রমণীর প্রাণে অতি আশ্চর্য্য সৎসাহস ও তেজস্বিতা ছিল। কোন প্রকার অন্যায়ের প্রশ্রয় তিনি দিতেন না।

মহারাণী প্রচুর দান ধ্যান করিয়া গিয়াছেন, তাহার পরিমাণ নির্ণয় করা অসাধ্য। তুলা-দান, সহস্র সহস্র গাভী দান, সুসজ্জিত গৃহ ও উদ্যান ব্রাহ্মণকে দান করিয়া গিয়াছেন। পতির নামে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া কত লোকের আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন, কত অপরাধীর কারাবাস দুঃখ মোচন করিয়াছেন। দেশের অর্থ অপহরণের অপরাধে দণ্ডিত জনৈক সুবাকে পঁচিশ হাজার টাকা দিয়া জল্লাদের হস্ত হইতে রক্ষা করেন। হিন্দুশাস্ত্রে যে সকল ক্রিয়া কর্ম্মে পুণ্য সঞ্চয় হয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার কিছুই তিনি অননুষ্ঠিত রাখেন নাই। রোগ শয্যায় পড়িয়া শাস্ত্র কথা শ্রবণে তিনি কত সময় অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার মত পুণ্যবতী নারী পৃথিবীতে অতি অল্পই জন্ম গ্রহণ করে। তিনি এই বিশাল নেপাল রাজ্যের প্রধান রমণী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার আত্মীয় স্বজন ও দূরাগত বিদেশী, যাহারা তাঁহার সংস্পর্শে আসিত তাহারাই তাঁহার সৌজন্য, দয়া, মিষ্টভাষিতা প্রভৃতি গুণে মোহিত হইত। তিনি অতিশয় দূরদর্শিনী, বুদ্ধিমতী রমণী ছিলেন। তাঁহার প্রত্যেক কার্য্য তাঁহার সুবুদ্ধি এবং সদ্বিবেচনার পরিচয় দিত। মহৎ প্রকৃতিই স্বীয় মহত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারে। তিনি সম্পূর্ণরূপে আপনার উচ্চ পদের গৌরব রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। শুধু পদের গৌরব রক্ষা কেন, তিনি স্বীয় পদের গৌরব বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। এরূপ নারীরত্ন শুধু এদেশের কেন, সমস্ত হিন্দু রমণীর গৌরব স্থল। সমগ্র নারীমণ্ডলী তাঁহার দৃষ্টান্তে পতিভক্তি, পতিসেবা, গুরুভক্তি, সন্তানের শিক্ষা, প্রজাপালন প্রভৃতি সকল গুণই শিক্ষা করিতে পারে।

এই দুর্ভেদ্য গিরি প্রদেশে, রাজান্তঃপুরে, নরচক্ষুর অগোচরে এমন রমণীরত্ন আবির্ভূত হইয়াছিলেন, যাঁহার নাম স্মরণ করিলে হৃদয় শ্রদ্ধাভরে অবনত হয়। মহারাজ চন্দ্র সামসের জঙ্গ রাণা বাহাদুর ভাগ্যবান্ পুরুষ সিংহ, যিনি এমন রমণীরত্ন লাভ করিয়াছিলেন। তিনিত অমর ধামে গমন করিয়াছেন তাঁহার পুণ্যচরিত অমর হউক, তাঁহার পুণ্য সকলকে রক্ষা করুক।

শ্রীহেমলতা দেবী।

ভারত-মহিলা।

অয়ি ভারত-মহিলা, ধন্য তুমি দেবি!
কোটী যুগ যুগান্তর কোটী কণ্ঠস্বর
ভক্তি-প্রেম-উচ্ছ্বসিত পবিত্র ধ্বনিতে
তোমার মহিমা-গাথা গাহিছে ধরায়,—
তোমার অমিয় স্নেহ করুণা-নির্ঝর
ঢালিছে শান্তির ধারা কোটী কোটী প্রাণে!
জননি, বনিতা, ভগ্নি,—তোমার প্রভাব
পুণ্য-তীর্থ-বারি সম দিতেছে প্রক্ষালি
পাপের পঙ্কিল স্পর্শ, কলুষ কালিমা।
আমরা ভক্তের জাতি, মন্ত্র-উপাসক,
তোমার অধ্যাত্ম-মূর্ত্তি মানস-মণ্ডপে
করিব অর্চ্চনা, র'বে আদর্শ তোমার
উদ্দীপনা-জ্ঞান-ধর্ম্ম-শক্তির নিকর
ওঁকার-বিদিত-ভূমে অনন্ত বৎসর!

শ্রীসুরেশ চন্দ্র ঘটক।

ভারতে জাতীয় জীবন।

ইংরেজীতে ন্যাসন (nation) বা জাতি বলিলে যাহা বুঝায়, ভারতবর্ষে কখনও তাহার অস্তিত্ব ছিল না। রামায়ণ ও মহাভারতে ভারতবর্ষের যে রাজনৈতিক চিত্র পাওয়া যায় তাহাতে ভারতের রাজ্যগুলীকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্বার্থবিশিষ্ট বিভিন্ন প্রদেশের স্বাধীন রাজা বলিয়াই অনুমান হয়। রাজাদিগের মধ্যে কেহ অপেক্ষাকৃত বলশালী হইলে দিগ্বিজয় করিতেন, কিন্তু বিজেতার নিকট বিজিতের সাময়িক অধীনতা স্বীকার ব্যতীত এই দিগ্বিজয় দ্বারা কোন স্থায়ী ফল হইত না, বিজিত প্রদেশ গুলিতে এক রাজনৈতিক জাতি গঠন বিষয়ে কোন সাহায্য হইত না। সম্রাট অশোক উত্তর ভারতের বিস্তৃত ভূখণ্ডে আপনার একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারই তাঁহার রাজ্য বিস্তারের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এবং তাঁহার এই উদ্দেশ্য সফলও হইয়াছিল। এক শাসকের শাসনাধীনতা ও ধর্ম্মের একতা জাতি গঠনের অতি উৎকৃষ্ট উপাদান, কিন্তু প্রাচ্য মহাদেশে প্রজাশক্তির উপর রাজশক্তির অনিয়ন্ত্রিত প্রভুত্ব এবং বৌদ্ধধর্ম্মের সন্ন্যাস-ভাবাত্মক শিক্ষা,—প্রধানতঃ এই দুই কারণে এদেশে সেই অনুকূল সময়েও স্বদেশ হিতৈষণা বিশেষ বর্দ্ধিত হয় নাই। মুশলমান বিজয়ের সময়ে ভারতবাসী এবিষয়ে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল, ইতিহাস পাঠে এরূপ বোধ হয় না। রাজপুত-জাতির স্বদেশ-হিতৈষণা রাজপুতনার খণ্ড রাজ্য সমূহেই আবদ্ধ ছিল। স্বাধীনতার লীলাভূমি রাজপুতনায়ও এক অখণ্ড রাজনৈতিক জাতি কখন গঠিত হয় নাই।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে মহারাষ্ট্র দেশে ছত্রপতি মহারাজ শিবজী ও পঞ্চনদ প্রদেশে শিখগুরু গোবিন্দ সিংহ ধর্ম্মের উপর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া জাতীয় একতা স্থাপনে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম জাতীয়তা স্থাপনের পক্ষে দৃঢ় ভিত্তি নহে, এজন্য শিবজীর চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল এবং উপযুক্ত নায়কের অভাবে ও প্রবলতর প্রতিদ্বন্দী শক্তির সহিত ঘাত প্রতিঘাতে শিখদিগের উদীয়মান জাতীয় জীবন দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। ভারতবর্ষের ইতিহাসে জাতীয় জীবন-প্রতিষ্ঠার দৃষ্টান্ত নাই, ভারতবাসীর প্রাচীন শিক্ষা দীক্ষা,—সুতরাং ভারতবাসীর প্রকৃতিও সাধারণতঃ ইহার অনুকূল নহে। বর্ত্তমান সময়ে এদেশে রাজনৈতিক

জাতি-প্রতিষ্ঠার যে ব্যাকুল চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে তজ্জন্য আমরা ইংরেজ জাতির নিকট ঋণী। ইংরেজের অধীনে থাকিয়া, ইংরেজের সংস্পর্শে আসিয়া, ইংরেজী শিক্ষা লাভ করিয়া আমরা জাতীয় জীবনের অর্থ বুঝিতে পরিয়াছি।

জাতীয় জীবন গঠনের কতকগুলি উপকরণ আছে। এক দেশে বাস করিলেই সে দেশবাসীরা এক রাজনৈতিক জাতিতে পরিণত হয় না। দেশের অনুকূল ভৌগলিক অবস্থান, অধিবাসীদিগের পরস্পরের সহিত রক্তসম্বন্ধ, স্বার্থ, ভাষা ও শাসন প্রণালীর একতা, উপরোক্ত উপাদান সমূহের মধ্যে প্রধান। যে স্থলে এই সকল উপাদান বিদ্যমান আছে সেখানে স্বভাবতঃই জাতীয় জীবন, জাতীয় একতা অবস্থিতি করে। ভারতবর্ষে এই সকল উপকরণ কখনও যথেষ্ট পরিমাণে বর্ত্তমান ছিল না, এখনও নাই।

প্রথমতঃ এ দেশের ভৌগলিক অবস্থানের বিষয় আলোচনা করা যাউক। এই বিশাল দেশের বহু কোটী অধিবাসীর মধ্যে ঘনিষ্ঠ জাতীয় ভাবের অনুভূতি অসম্ভব না হইলেও নিতান্ত সহজসাধ্য নহে। বিস্তৃতি ও গভীরতা খুব অল্প স্থলেই একত্র অবস্থিতি করে। প্রাকৃতিক বিচিত্রতা বশতঃ ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের আচার ব্যবহার, আহার বিহার এবং বেশ ভূষাও বিচিত্র হইয়া পড়িয়াছে। পঞ্জাব ও বোম্বাইয়ের আহার্য্য বিভিন্ন প্রকার। মান্দ্রাজীর গৃহে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলে বাঙ্গালীকে উদরাময়ের অবশ্যম্ভাবী আক্রমণের জন্য পূর্ব্বেই প্রস্তুত হইতে হয়। ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন দেশ সমূহের মধ্যে বরং আহার বিহারে অনেক একতা আছে, কিন্তু ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ সমূহের মধ্যে এ সকল বিষয়ে কোন রূপ একতা নাই।

তৎপর রক্ত-সম্বন্ধ—আমরা আর্য্যজাতি বলিয়া গৌরব করি বটে কিন্তু ভারতবর্ষের অধিকাংশ অধিবাসীই যে আর্য্যবংশসম্ভূত নহে আধুনিক পণ্ডিতগণের গবেষণা তাহা নিঃসন্দিগ্ধ রূপে প্রমাণ করিয়াছে। পঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় হিন্দুগণ প্রাচীন আর্য্যগণের উত্তরাধিকারী বলিয়া গৌরব করিতে পারেন, কিন্তু বাঙ্গালী, মারাঠী মান্দ্রাজী ও গুজরাটীগণ কখনই অবিমিশ্র আর্য্য-সন্তান নহেন। হিন্দু আর্য্যগণ ও এদেশের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর আদিম অধিবাসীর সংমিশ্রণে এই সকল জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। মান্দ্রাজবাসীগণ প্রধানতঃ দ্রাবিড় জাতীয়। ভারতীয় হিন্দুগণের মধ্যে রক্তসম্বন্ধ এই প্রকার ক্ষীণ। মুসলমানগণ ত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মূল হইতে উৎপন্ন।

ভাষার একতা—ভারতবর্ষে ভাষার বিচিত্রতা জাতীয় একতা প্রতিষ্ঠার কি প্রবল অন্তরায় বাংলা দেশে থাকিয়া তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করা সম্ভবপর নহে। সমগ্র বঙ্গদেশে একই ভাষা প্রচলিত। দিন দিন উপভাষা গুলির দূরত্ব লোপ পাইতেছে এবং সমগ্র বঙ্গে এক বাংলা ভাষার অক্ষুন্ন আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। উত্তর ভারতেও শুধু হিন্দি ও উর্দ্দুই প্রচলিত। কিন্তু দাক্ষিণাত্যে গমন করিলে ভাষার বহুলতা দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। বোম্বাই অঞ্চলে মারাঠী, গুজরাটী প্রভৃতি কতকগুলি ভাষা প্রচলিত। মান্দ্রাজ প্রদেশে মালয়ালম, কেনারিজ, তামিল, তেলেগু প্রভৃতি বহুসংখ্যক ভাষা এক অপূর্ব্ব 'বাবেলের' সৃষ্টি করিয়াছে। কোন বৃহৎ সহরে ধর্ম্মমন্দিরে এক অঞ্চলের ভাষায় উপাসনা করিলে অন্য অঞ্চলের লোকেরা তাহা বুঝিতে পারে না। এক দেশের একটী মাত্র বিভাগে এত বহু ভাষার প্রচলন সভ্য জগতের আর কোথাও আছে বলিয়া বোধ হয় না।

স্বার্থের একতা—ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের অধিবাসীরা প্রধানতঃ বাণিজ্যজীবী। জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য তাহাদিগকে নানা দেশবাসীর সংস্পর্শে আসিতে হয়, বাণিজ্যের রক্ষা ও শ্রীবৃদ্ধি এবং বিরোধী শক্তির প্রভাব বিনষ্ট করিবার জন্য এক স্বার্থ বিশিষ্ট বণিক সম্প্রদায়কে দলবদ্ধ হইতে হয়। স্বার্থের এই একতা ইংলণ্ড প্রভৃতি বাণিজ্য প্রধান দেশে জাতীয় জীবনে অপূর্ব্ব শক্তি আনয়ন করিয়াছে। ভারতবাসী প্রধানতঃ কৃষিজীবী। কৃষিজীবী জাতির স্বার্থ অতি সংকীর্ণ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। কৃষির রক্ষা বা শ্রীবৃদ্ধির জন্য অনেক লোকের ঘনিষ্ঠ ভাবে একত্র মিলিত হইবার কোন প্রয়োজন হয় না।

সুতরাং ভারতবাসী জাতীয় একতা বৃদ্ধির এই এক প্রধান উপকরণে বঞ্চিত।

ধর্ম্মের একতা—ভারতবর্ষ হিন্দু-প্রধান দেশ, এজন্য প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় ধর্ম্মের একতা রূপ প্রবল বন্ধনীশক্তি যখন বিদ্যমান আছে তখন এদেশে জাতীয় একতা স্থাপন আর তেমন কঠিন কর্ম্ম কি? কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই এই ভ্রম দূর হয়। প্রথমতঃ হিন্দু ও মুসলমান এই দুই প্রধান ভাগে ভারতবাসী বিভক্ত। এই দুই ধর্ম্মে অনেক বিষয়ে বিরোধ রহিয়াছে। হিন্দুধর্ম্ম আপন রক্ষণশীলতার প্রভাবে খ্রীষ্টীয় ও মহম্মদীয় ধর্ম্মের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও স্বীয় দেহোৎপন্ন বৌদ্ধ, জৈন, শিখ প্রভৃতি সংস্কারক ধর্ম্মের দারুণ আঘাত সহ্য করিয়াও জীবিত রহিয়াছে সত্য, কিন্তু এই সকল ধর্ম্মের প্রত্যেকটীর সহিতই ইহাকে সন্ধি স্থাপন করিতে হইয়াছে, এই সন্ধি স্থাপনের জন্য ইহার অন্তর্নিহিত শক্তি যথেষ্ট হ্রাস হইয়াছে। হিন্দুধর্ম্ম আপনার আশ্রিতদিগকে কোন গুরুতর কার্য্যে আর উৎসাহিত করিতে পারিতেছে না।

এই বিরোধী ধর্ম্মের সহিত সংগ্রাম জনিত দুর্ব্বলতার কথা ছাড়িয়া দিলেও হিন্দুধর্ম্মে জাতীয় একতার শ্রীবৃদ্ধি সাধক তেমন কোন শক্তি দৃষ্ট হয় না। হিন্দুধর্ম্মের শাখা উপশাখা গুলির বিষয় চিন্তা করিলে প্রবল নিরাশার উদ্রেক হয়। বাংলার হিন্দুধর্ম্মে ও মান্দ্রাজের হিন্দুধর্ম্মে, পঞ্জাবের হিন্দুধর্ম্মে ও বোম্বাইয়ের হিন্দুধর্ম্মে প্রচুর ব্যবধান। বঙ্গদেশে যে সকল দেব দেবীর পূজা হয় বোম্বাই প্রভৃতি অঞ্চলে তাহাদের নাম পর্য্যন্ত অজ্ঞাত। বঙ্গদেশে ভাগিনেয়ী বিবাহ ও মাতুল কন্যা বিবাহের কথা শুনিলে লোকে কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করে, কিন্তু মান্দ্রাজ প্রদেশে উপযুক্তা মাতুল কন্যা বর্ত্তমান থাকিলে অন্যত্র বিবাহের চিন্তা মনেই জাগে না। বোম্বাই প্রদেশে মাতুল ভাগিনেয়ীকে বিবাহ করিয়া থাকে।

জাতিভেদ প্রথা জাতীয় একতা সংস্থাপনের অতি প্রবল শত্রু। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই এই প্রথার প্রবল প্রভাব বিদ্যমান। মান্দ্রাজ অঞ্চলে ব্রাহ্মণগণ অসংখ্য শাখায় বিভক্ত। ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উপাসকগণ পরস্পরের সহিত আহার বিহার করে না। দ্বৈতবাদী ব্রাহ্মণ অদ্বৈতবাদীর স্পৃষ্ট জল পান করে না। শূদ্রের আনীত জলে ব্রাহ্মণগণ স্নান পর্য্যন্ত করে না। নিম্নশ্রেণীর শূদ্রগণ ঐ অঞ্চলে ব্রাহ্মণাদি উচ্চতর বর্ণের দ্বারা এখনও কি নিদারুণ ভাবে উৎপীড়িত হইতেছে, তাহা শ্রবণ করিলে শোণিত উষ্ণ হইয়া উঠে। দেব-মন্দিরের প্রাঙ্গণে বা চতুঃসীমায় [illegible] নিম্নশ্রেণীর শূদ্রগণের প্রবেশাধিকার নাই। তাহাদের প্রদত্ত দানাদি ব্রাহ্মণগণ দেবতার নিকট উৎসর্গ করে না। নিম্নশ্রেণীর কোন শূদ্র দেবমন্দির সংস্পৃষ্ট জলাশয়ে স্নান করিতে পারে না, কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিলে সেই ব্যক্তিই এই স্নানের অধিকার লাভ করে। দেবমন্দিরের কোন কোন স্থানে বাইবেল হস্তে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারক স্বীয় ধর্ম্ম প্রচার করিতে পারে, কিন্তু ইংরেজী ও সংস্কৃতে সুপণ্ডিত নিম্নশ্রেণীর শূদ্র ভগবদ্গীতা হস্তে হিন্দুধর্ম্ম প্রচারের জন্য সেখানে গমন করিলে সেই স্থান অপবিত্র হয়। মান্দ্রাজের অন্তর্গত মেঙ্গালোর সহরে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ একজন অতি নিম্ন শ্রেণীর শূদ্র এক দিন একটী ছাতা ব্যবহার করিয়াছিল। উচ্চতর বর্ণের লোকদিগের নিকট ইহা এতই গুরুতর ধৃষ্টতা বলিয়া মনে হইয়াছিল যে, তাহাদের নিদারুণ প্রহারে হতভাগ্য যুবককে কয়েক দিন শয্যাশায়ী থাকিতে হইয়াছিল। এই প্রকার জাতিভেদ যে দেশে বর্ত্তমান জাতীয় ভ্রাতৃভাবের প্রতিষ্ঠা সে দেশে কি কঠিন ব্যাপার!

বর্ত্তমান অতীতেরই সন্তান। হিন্দুধর্ম্ম কোন দিনই ভারতবর্ষে জাতীয় উদ্দীপনার সৃষ্টি করিতে পারে নাই। মধ্যযুগে বিরুদ্ধ স্বার্থ বিশিষ্ট ইউরোপীয় জাতি সকল শুধু ধর্ম্মের নামে মিলিত হইয়া জেরুজালেম উদ্ধারের জন্য মুসলমানদিগের সহিত দীর্ঘ কাল যুদ্ধ করিয়াছিল। মুসলমানগণ ধর্ম্মের বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া পৃথিবীর বিস্তৃত ভূভাগ অধিকার করিয়াছিল। এখনও ধর্ম্মের নামে পৃথিবীর দূর দূরান্তরবাসী মুসলমানগণ এক-প্রাণ হইয়া উঠে; কিন্তু হিন্দুর দেশে হিন্দুরাজ্য সংস্থাপনে

প্রয়াসী হইয়া মোগল সাম্রাজ্যের পতনকাল রূপ অনুকূল সময়েও শিবজী হিন্দু-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই। সুতরাং বাহ্য দৃষ্টিতে যাহাই মনে হউক, প্রকৃত পক্ষে জাতীয় একতা সংস্থাপন বিষয়ে ভারতবাসী ধর্ম্মের উদ্দীপনা জনিত অত্যুৎকৃষ্ট শক্তিতে বঞ্চিত। শুধু বঞ্চিত বলিলে ঠিক বলা হয় না, প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম জাতীয় একতার বিরোধী।

উপরে যে কয়টী বিষয় আলোচিত হইল, সকলগুলিই জাতীয় জীবন গঠন বিষয়ে আমাদের প্রতিকূল। তথাপি যে এদেশে জাতীয় এক-প্রাণতার একটু বিকাশ দেখা যাইতেছে, ইংরেজের শাসন ও শিক্ষাই তাহার কারণ। বাধ্য হইয়া ইংরেজী শিক্ষা লাভ করিয়া আমরা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশস্থ ভারতবাসীগণ পরস্পরের সহিত পরিচয় ও ভাব বিনিময় করিতে পারিতেছি। রেল ও সংবাদ পত্র দিন দিন ভৌগলিক দূরত্ব হ্রাস করিতেছে। একই শিক্ষা ভারতবাসীকে এক ভাবাপন্ন করিতেছে ও একই আদর্শের দিকে লইয়া যাইতেছে, সকলের প্রাণে এক আকাঙ্ক্ষা জাগাইতেছে। ইংরেজ ভারতে একচ্ছত্র আধিপত্য লাভ করাতে ইংরেজের অত্যাচার সকল ভারতবাসীকে সমভাবে স্পর্শ করিয়া এক জাতিতে পরিণত করিবার পক্ষে এক প্রবল সহায় স্বরূপ হইয়াছে। অপর দিকে ইংরেজের শিক্ষা ও ইতিহাস আমাদিগের নিকট ইংরেজের অত্যাচার দমনের উপায় প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে জাতীয় জীবন লাভে উৎসাহী করিতেছে। সকল প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও জাতীয় জীবন গঠনের জন্য পরাধীন দেশের অধিবাসীগণের অন্তরে একটা আকাঙ্ক্ষার উদয় হয়, উপরোক্ত উপায়ে ইংরেজ ভারতবাসীর সেই আকাঙ্ক্ষা দিন দিন শক্তিশালী করিতেছে। ইংরেজ ইচ্ছা করিয়া আপনার স্বার্থের মূলে কুঠারাঘাত করে নাই, তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দিন দিন ভারতে জাতীয় ভাব বর্দ্ধিত হইতেছে। এই ভাবের বিনাশ সাধনে ইংরেজ যে উদাসীন নহে, আমরা নিয়ত তাহার পরিচয় পাইতেছি।

ইংরেজের এই বিরুদ্ধাচরণ এবং এদেশে রাজনৈতিক জাতি-গঠনের সাধারণ উপাদান সমূহের অভাবের বিষয় যখন চিন্তা করি, তখন ভারতবাসীর রাজনৈতিক উত্থানের আশা এক প্রকার অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু দুঃসাধ্য হইলেও ইহা যে অসম্ভব নহে একথা এখন আমরা সকলেই বুঝিতে পারিয়াছি। আমাদের জাতীয় উদ্দীপনার প্রকৃত কেন্দ্র আবিষ্কার করিয়া আমরা যদি তাহার মূলে শক্তি সঞ্চারের জন্য সাধনায় প্রবৃত্ত হই, তবে সেই কেন্দ্র হইতে দৈব বল বিকীর্ণ হইয়া সমগ্র ভারতকে সঞ্জীবিত করিবে। এই কেন্দ্র স্বদেশানুরাগ; স্বদেশ প্রীতির হোমানল প্রাণে প্রজ্বলিত করিয়া তোলাই এই সাধনা। অন্যান্য অনুকূল উপাদানের অভাব যত বেশী, এই স্বদেশানুরাগ সেই পরিমাণে বর্দ্ধিত না করিলে আমাদের জাতীয় উন্নতির আশা নাই।

'স্বদেশানুরাগ' কথাটা এদেশে অতি পুরাতন, কিন্তু অখণ্ড একচ্ছত্র ভারতে এই সাধনা সম্পূর্ণই নূতন। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীগণ ও হিন্দুধর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের লোক মিলিত হইয়া, অশন বসন ও আচার ব্যবহারের পার্থক্য বিস্মৃত হইয়া জাতীয় একপ্রাণতা সাধন ভারতবাসীর পক্ষে সহজ ব্যাপার নহে। জাতীয় মহাসমিতির দৃষ্টান্ত স্মরণ করিয়া যদি আমরা ইহা সহজসাধ্য মনে করি তবে আমাদিগকে বিষম ভ্রমে পড়িতে হইবে। জাতীয় মহাসমিতি আমাদের অনেক উপকার করিয়াছে সত্য, কিন্তু উহা সাধন-মন্দিরের বহির্দ্বারেই দণ্ডায়মান রহিয়াছে, আমাদিগকে ভিতরে প্রবেশ করিতে হইবে। শত শত বৎসরের পরাধীনতা আমাদের জাতীয় প্রকৃতিকে অত্যন্ত দুর্ব্বল ও স্বদেশ প্রীতির আদর্শকে নিতান্ত খর্ব্ব করিয়া ফেলিয়াছে। আমরা সহজে আপন আপন ক্ষুদ্র স্বার্থের গণ্ডীর বাহিরে যাইতে পারি না। সাময়িক উত্তেজনা ক্ষণকালের জন্য আমাদিগকে ক্ষুদ্রাশয়তার সীমার বাহিরে লইয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহা স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা অল্প। তবে এই উত্তেজনার এক মহৎ ফল এই যে, ইহা আমাদিগকে সাধনে উৎসাহিত করে।

সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম-পার্থক্যের প্রতি উদাসীন হইয়া মনুষ্য জাতির সাধারণ ধর্ম্ম ঈশ্বর-বিশ্বাস, সত্য, ন্যায়পরতা

প্রাণে লইয়া ভারতের হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি সকল সম্প্রদায় যদি স্বদেশ-প্রীতি সাধনে মনোযোগী হন তবে সকল বিষয়েই ভারতে নবজীবনের আবির্ভাব হইবে।

মানুষকে মনুষ্যত্ব-বিকাশের বিরোধী বন্ধনগুলি হইতে মুক্ত ও স্বার্থের গভীর কূপ হইতে উত্তোলন করিতে না পারিলে উৎকৃষ্ট ধর্ম্মমত গ্রহণ করিয়াও সে যে আঁধারে সেই আঁধারেই পড়িয়া থাকে। দীর্ঘকালের রাজনৈতিক পরাধীনতায় ভারতবাসী স্বাবলম্বন ও স্বাধীন চিন্তা-বিহীন হইয়া পড়িয়াছে। স্বাধীন জাতিরূপে জাতীয় দায়িত্বজ্ঞান অন্তরে লইয়া তাহারা যদি পৃথিবীর সভ্য জাতি সমূহের সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ পাইত, তবে ভারতের ধর্ম্ম ও সমাজ আপনা হইতেই বহু আবর্জ্জনা পরিত্যাগ করিত,—দেহ সবল থাকিলে শরীরে প্রবিষ্ট রোগের বীজাণু সহজেই বিনষ্ট হয়। কিন্তু দীর্ঘকাল পরাধীনতায় ভুগিয়া ভুগিয়া ভারতবাসী এখন কিছুতেই সুস্থ সবল মানুষের ন্যায় আপন পায়ের উপর দাঁড়াইতে পারিতেছে না। উৎকৃষ্ট পদার্থ সম্মুখে উপস্থিত করিলেও তাহা রোগীর উপযোগী করিয়া গ্রহণ করিতেছে। এই জন্য দেখিতেছি উচ্চাঙ্গের ধর্ম্মমত গ্রহণ করিলেও ভারতবাসী সেই মতগুলিকে জীবনে কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেছে না, যাহা জীবনে সাধন করিবার বস্তু ভাবুকতাতেই তাহা পর্য্যবসিত হইতেছে। ধর্ম্ম প্রচারকগণ যদি এখন জাতীয় জীবনের উদ্বোধন কার্য্যে আপনাদের শক্তি ও সময় নিয়োগ করেন, তবে পরিণামে বিশেষ লাভবান হইতে পারেন। এক উচ্চ লক্ষ্য সাধনের ব্যাকুল চেষ্টায় দেশের লোকের মনুষ্যত্বের বিকাশ হইলে তখন উর্ব্বর ভূমিতে নিক্ষিপ্ত বীজের ন্যায় ধর্ম্মের সুসংস্কৃত মত জীবনী শক্তি বিশিষ্ট মানুষের হৃদয়ে পড়িয়া উৎকৃষ্ট ফল প্রসব করিবে।

দেশের উন্নতিই যদি সকলের লক্ষ্য হয়, তবে দেশের কল্যাণের জন্যই কার্য্যক্ষেত্র হইতে অপ্রেম পলায়ন করিবে। হিন্দু মুসলমানে অপ্রীতি, নীচ জাতি সমূহের প্রতি অত্যাচার দেশের উন্নতির অন্তরায় হইলে শুধু এই কারণেই ইহা বিলুপ্ত হইবে। নিম্নশ্রেণীর মূর্খতা দেশের উন্নতির বাধা স্বরূপ হইলে তাহাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের উপায় আবিষ্কৃত হইবে। এক খাঁটি স্বদেশ প্রীতির সাধনা ভারতবাসীকে মনুষ্যত্বের উচ্চতর সোপানে উন্নীত করিবে।

এই সাধনার একটী প্রণালী চাই। পৃথিবীর পতিত জাতি সমূহের উথানের ইতিহাস হইতে আমাদিগকে এই প্রণালী আবিষ্কার করিতে হইবে। সর্ব্বপ্রথমে এক দল আত্মত্যাগী মানুষের প্রয়োজন। স্বদেশ-পূজায় উৎসর্গীকৃত-জীবন, ঈশ্বরপরায়ণ, মাতৃভক্ত সন্তান-দল গঠিত না হইলে আমাদের উথান-চেষ্টা সফল হইবে না; কোন দেশে কোন কালে হয় নাই। এদেশে সেরূপ সন্তান দল এখনও আবির্ভূত হয় নাই। এই সন্তান-দল অনন্যকর্ম্মা হইয়া স্বদেশ-প্রীতি সাধনে নিযুক্ত হইবেন। এই মণ্ডলীর সকলে একত্র অবস্থান করিয়া চরিত্রে দৃঢ়তা, পরস্পরের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব অনুশীলন করিবেন। দেশের ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান প্রতিদিন গভীর ভাবে ধ্যান করিবেন। পৃথিবীর পতিত জাতি সমূহ কি প্রকারে উঠিতে সমর্থ হইয়াছে তাহার ইতিহাস পাঠ করিবেন। ম্যাট্‌সিনি ওয়াসিংটন ও প্রতাপ সিংহ প্রভৃতি স্বদেশ-ব্রত মহা-পুরুষদিগের জীবনী অধ্যয়ন ও তাঁহাদের চরিত্র জীবনে সাধন করিবেন। সমগ্র মন প্রাণ দিয়া ঈশ্বরে বিশ্বাস ও ভক্তি, জ্ঞানে গভীরতা ও প্রেমে বিশালতা উপার্জ্জন করিবেন এবং ঈশ্বর ও আদর্শের নিকট খাঁটি ও অটল থাকিয়া জীবন পথে অগ্রসর হইবেন। দেশের জাগরণের জন্য ঈশ্বরের নিকট ব্যাকুল হৃদয়ে প্রর্থনা করিবেন। এই প্রকার সন্তান দল যত দিন সাধনক্ষেত্রে অগ্রসর না হইবেন তত দিন আসল কাজ আরম্ভ হইবে না। অদ্ভুত কর্ম্ম-শীলতা, উৎকৃষ্ট বাগ্মিতা, যত কিছু শক্তি থাকুক না কেন, জীবনের পশ্চাতে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সাধন-শক্তি সঞ্চিত না থাকিলে প্রকৃত কার্য্য আর কিছুতেই সুসিদ্ধ হইবে না। জাতীয় দুর্গতি দূর করিবার আর কোন পন্থা নাই। দেশের কাজ দশ জনে যে ভাবে করিতেছেন সেই ভাবেই করিতে থাকুন, আর এই সাধক দল নীরব সাধনায় প্রবৃত্ত থাকুন। সাধন সমাপানান্তে সন্তান দল

তাঁহাদের সাধন-সম্পদ লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবেন, ইঁহাদের আহ্বানে দেশে নব শক্তির আবির্ভাব হইবে, ইঁহাদের প্রার্থনায় দেশে জলন্ত স্বদেশপ্রীতি অবতীর্ণ হইবে। সাধন-শক্তি পশ্চাতে থাকিয়া ইঁহাদের বাক্যকে দৈব বলে বলী করিবে।

এই জাতীয় মহা সাধনায় দেশের নারীশক্তিকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। নারীশক্তিকে দুর্ব্বল করিয়া আমরা ঘোর অপরাধী হইয়াছি। সমাজে প্রভুশক্তি লাভ করতঃ সেই প্রভুত্ব বলে নারীশক্তিকে সঙ্কুচিত, দলিত করিয়া আমরা আপনারাই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি। এখন এই ভ্রান্ত পথ পরিত্যাগ করিতে হইবে। দেশোদ্ধার রূপ পুণ্যব্রতে দেশের কন্যাগণকেও পুরুষগণের ন্যায় কঠোর সাধনায় নিযুক্ত হইতে হইবে। তাঁহাদের সাহায্য ব্যতীত পুরুষদিগের চেষ্টা কিছুতেই সফল হইবে না।

আমরা এই ভাবী সন্তান-দলের আবির্ভাব কাল অতি নিকটবর্ত্তী অনুভব করিতেছি। এই সময় দেশের নরনারী সকলে মিলিত হইয়া ইঁহাদের আগমনের জন্য ব্যাকুল হৃদয়ে প্রার্থনা করিতে থাকুন।

শ্রীহেমেন্দ্র নাথ দত্ত।

বৈদিক সমাজ-চিত্র।

চতুর্থ অধ্যায়।

পরদিন যথাকালে মুনিবর ও তদীয় পত্নীদ্বয় তপোগৃহে সমবেত হইলেন। পূর্ব্ব দিনের অসম্পূর্ণ আলোচনা পুনরারব্ধ হইল। মৈত্রেয়ীই প্রথমে মুনিবরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

মৈত্রেয়ী। আমি কা'ল রাত্রিতে, আপনারা শয়ন গৃহে গেলে পর, বিজ্ঞানাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ ও অভেদ বিষয়ে অনেক চিন্তা করিলাম। আপনার সমস্ত উক্তিগুলি একত্র করিয়া বিষয়টী বুঝিতে চেষ্টা করিলাম। আমি যাহা বুঝিয়াছি তাহা ঠিক কি না আপনি দেখুন।

কাত্যায়নী। কেবল নিজে বুঝিলে হইবে না, আমাকে বুঝাইতে হইবে। আচ্ছা তুমি কি বুঝিয়াছ বল।

মৈত্রেয়ী। আমাকে প্রশ্ন করিলে আমি যথাবুদ্ধি উত্তর দিতে চেষ্টা করিব, একবারে সমস্ত বিষয়টা বোধ হয় বলিতে পারিব না।

যাজ্ঞবল্ক্য। সেই প্রণালীই ভাল। আচ্ছা, বল এই দীপটী জানিতে যাইয়া তুমি আর কিছু জান কি না।

কাত্যায়নী। আচ্ছা, উত্তর আমি যতদূর পারি দিতে চেষ্টা করি না কেন? তা'তে আমারও জ্ঞানের পরীক্ষা হইবে।

মৈত্রেয়ী। আচ্ছা, তুমিই উত্তর দাও। আমার সঙ্গে যখন তোমার উত্তর না মিলিবে, তখন আমি বলিব।

কাত্যায়নী। আচ্ছা, জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর এই যে, দীপটী জানিতে যাইয়া আমি ইহাকে জ্ঞেয় ও সঙ্গে সঙ্গে নিজ আত্মাকে জ্ঞাতারূপে জানি। আত্মজ্ঞান ও বিষয়-জ্ঞান এক সঙ্গে হয়। কোনটা কোনটাকে ছাড়িয়া হয় না।

মৈত্রেয়ী। দু'টা স্বতন্ত্র বস্তু জানি, না একটা বস্তুই জানি?

কাত্যায়নী। দু'টা বস্তু জানি, কিন্তু দু'টা পরস্পর সংযুক্ত। সেই সংযোগ-সূত্র জ্ঞান।

মৈত্রেয়ী। সংযোগটা তোমার জ্ঞানক্রিয়ার সময়ে হয়, না পূর্ব্বাবধিই থাকে, জ্ঞানক্রিয়ার পরেও থাকে?

কাত্যায়নী। কল্যকার কথা আমার যতদূর মনে আছে, তাহাতে বোধ হয় এই যোগটা স্থায়ী, জ্ঞানক্রিয়ার পরেও থাকে; কারণ কথা হইয়াছিল, যে দীপের দৃষ্টত্ব আমরা আরোপ করি না, আবিষ্কার করি।

মৈত্রেয়ী। তাহা হইলে এই দাঁড়াইতেছে, যে তোমার দেখার পূর্ব্বে এবং পরেও দীপটী জ্ঞানে বর্ত্তমান থাকে, অন্য কথায় আত্মাতে বর্ত্তমান থাকে।

কাত্যায়নী। তাহা ত দাঁড়াইতেছে, আর সেই আত্মাও আমারই আত্মা, এই কথাও হইয়াছিল।

মৈত্রেয়ী। সেই আত্মা আমাদেরই নিজ আত্মা।

প্রত্যেক জ্ঞানক্রিয়াতে তিনি বিষয়ের আশ্রয়রূপে প্রকাশিত হন। আর বিষয় আছে বলিলেও তাঁহাতে আছে, ইহাই ভাবিতে হয়।

যাজ্ঞবল্ক্য। তিনি কি কেবল বিষয়ের আশ্রয়? বিষয়ীর আশ্রয় নহেন?

কাত্যায়নী। তিনি ত স্বয়ংই বিষয়ী, বিষয়ীর আশ্রয় হইবেন কিরূপে?

যাজ্ঞবল্ক্য। তিনি স্বয়ং বিষয়ী কি অর্থে?

কাত্যায়নী। তিনি বিষয়ের জ্ঞাতা, জ্ঞানক্রিয়ার কর্ত্তা, এই অর্থে তিনি বিষয়ী।

যাজ্ঞবল্ক্য। তিনি জ্ঞানক্রিয়ার কর্ত্তা হইলেন কিরূপে?

কাত্যায়নী। এই যে আমি দীপটী দেখিতেছি, এই দৃষ্টিক্রিয়ার কর্ত্তা আমার আত্মা বই আর কে?

মৈত্রেয়ী। আত্মাতে ত বিষয় সর্ব্বদাই আশ্রিত রহিয়াছে। আত্মার জ্ঞান স্থায়ী, আত্মার জ্ঞান কার্য্যরূপ নহে। তুমি এই মাত্র বলিলে যে তোমার দীপ-দর্শনের পূর্ব্বে এবং পরেও দীপটী আত্মাতে দৃষ্টরূপে বর্ত্তমান থাকে।

কাত্যায়নী। তা'ত বলিয়াছি। কিন্তু এই যে আমি এখন দীপটী দেখিতেছি, এই দর্শনক্রিয়ার কর্ত্তা কি আমার আত্মা নহেন?

মৈত্রেয়ী। হাঁ, তোমারই আত্মা বটে, কিন্তু ইঁহার জ্ঞান স্থায়ী নহে, ইঁহার জ্ঞান কার্য্যরূপ। ইনি বিজ্ঞানাত্মা।

যাজ্ঞবল্ক্য। ইনিই বিষয়ী; ইনি কর্ত্তা, ইনি ভোক্তা। ইনি কার্য্য করেন ও কার্য্যের ফল ভোগ করেন। ইনি পরমাত্মার আশ্রিত।

কাত্যায়নী। আশ্রিত কি অর্থে?

যাজ্ঞবল্ক্য। যে অর্থে বিষয় আশ্রিত সেই অর্থে বিষয়ীও আশ্রিত।

কাত্যায়নী। বিষয় এই অর্থে আশ্রিত যে জ্ঞাতা না হইলে জ্ঞেয় সম্ভব নহে। জ্ঞাতা আশ্রিত কি অর্থে?

যাজ্ঞবল্ক্য। জ্ঞানক্রিয়া একটী পরিবর্ত্তন, একটী ঘটনা; ঘটনা মাত্রই বস্তু-সাপেক্ষ, পরিবর্ত্তনমাত্রই বস্তুর আশ্রিত। জ্ঞানক্রিয়ার আশ্রয় পরমাত্মা।

কাত্যায়নী। জ্ঞানক্রিয়ার আশ্রয়কে জ্ঞাতা বলি না কেন?

যাজ্ঞবল্ক্য। জ্ঞাতা নিরবলম্ব নহে, সে জ্ঞানক্রিয়ার অপেক্ষা রাখে। ক্রিয়া যেমন কর্ত্তার অপেক্ষা রাখে,—কর্ত্তা ছাড়া ক্রিয়া হইতে পারে না,—তেমনই কর্ত্তাও ক্রিয়ার অপেক্ষা রাখে, ক্রিয়া ছাড়া কর্ত্তার কর্ত্তৃত্ব অর্থহীন। সুতরাং কর্ত্তা কর্ম্ম উভয়ই আপেক্ষিক, উভয়ই নিরপেক্ষ পরমাত্মার আশ্রিত।

কাত্যায়নী। আমি বিষয়টী ভাল বুঝিতে পারিতেছি না।

মৈত্রেয়ী। আমি যাহা বুঝিয়াছি বলিতে চাই।

যাজ্ঞবল্ক্য। বল।

মৈত্রেয়ী। জ্ঞানক্রিয়ার হু'টী দিক্। এই ক্রিয়ার সময় আমরা ভাবি 'আমি বিষয়কে জানিতেছি' আর 'আমি বিষয়ের জ্ঞাতারূপে আত্মাকে জানিতেছি।' এই হু'টীই কার্য্য, হু'টীই পরিবর্ত্তন; আগে ছিল না, এখন হইল। কিন্তু এই ক্রিয়াকালে যে বস্তুটী প্রকাশিত হয় সেটী ক্রিয়া নহে, সেটী একটী স্থায়ী বস্তু। এই দীপটী জানিতে যাইয়া আমি যে জ্ঞানরূপী আত্মাকে জানি,—যে আত্মাতে দীপ এবং সমস্ত বিষয় আশ্রিত হইয়া আছে,—সেই আত্মা একটী স্থায়ী অপরিবর্ত্তনীয় বস্তু। তিনি কর্ত্তা নহেন, কর্ম্মও নহেন; অথচ কর্ত্তা কর্ম্ম উভয়েরই আশ্রয়। 'আমি দীপটী জানিলাম' তিনি এরূপ ভাবেন না, কারণ তিনি দীপটী সর্ব্বদা জানিয়াই আছেন। তাঁহার জ্ঞান ক্রিয়া নহে, স্থায়ী অবস্থা বা বস্তু। আমাদের আত্মজ্ঞান ও বিষয়জ্ঞান উভয়ই কার্য্য, উভয়ই অস্থায়ী ঘটনা, এবং সেই স্থায়ী বস্তুকে অবলম্বন করিয়া ঘটে।

যাজ্ঞবল্ক্য। তুমি ঠিক বুঝিয়াছ।

কাত্যায়নী। কেবল বুঝেছ নয়, বোধ হয় আমাকেও বুঝাইতে পারিয়াছ। এই সকল কথা কা'ল হইয়াছিল, আমি তোমার মত সংগ্রহ করিতে পারি নাই। তা'ত হবেই, আমি গেলাম ঘুমাইতে, তুমি বসিলে ধ্যানে;

তোমার বুঝাতে আর আমার বুঝাতে ত প্রভেদ হ'বেই। এখন দেখ, তোমার আসাতে বাড়ীটা ধন্য হইয়াছে কিনা ?

মৈত্রেয়ী। আবার ঝগড়ার কথা! এ সব কথা থাক্। এখন দেখা যাক্ আমরা বিজ্ঞানাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ বুঝিতে পারিয়াছি কি না।

কাত্যায়নী। ভেদ ও অভেদ দুইই বুঝিতে হইবে। অভেদটা কোথায় ?

মৈত্রেয়ী। অভেদ এই স্থলে যে পরমাত্মার স্থায়ী জ্ঞানের আংশিক প্রকাশই বিজ্ঞানাত্মার জীবন। সর্ব্বজ্ঞানাধার পরমাত্মা 'আমি দীপ, গৃহ অগ্নি প্রভৃতিকে জানিতেছি'—এইরূপ একটী বিশেষ কর্ত্তৃকর্ম্মরূপে আত্মপ্রকাশ করিলে—এই প্রকাশকে বিজ্ঞানাত্মা বলা যায়। পরমাত্মাই বিজ্ঞানাত্মার আত্মত্ব, বস্তুত্ব।

কাত্যায়নী। ভেদ কোথায় ?

মৈত্রেয়ী। ভেদ এই স্থলে যে বিজ্ঞানাত্মা কর্ত্তা, পরমাত্মা অকর্ত্তা, অবিকৃত। বিজ্ঞানাত্মার জ্ঞান অস্থায়ী—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তিতে আবির্ভাব তিরোভাবের অধীন; পরমাত্মার জ্ঞান অবিচ্ছিন্ন, অপ্রতিহত, চিরপ্রকাশিত। বিজ্ঞানাত্মা অল্পজ্ঞ, তাহার জ্ঞেয়ের পরিসর সর্ব্বদাই সীমাবদ্ধ; পরমাত্মা সর্ব্বজ্ঞ, সমুদয় বিষয় তাঁহার জ্ঞানে চিরবর্ত্তমান। বিজ্ঞানাত্মা আপেক্ষিক, পরতন্ত্র, পরমাত্মার অধীন; পরমাত্মা নিরপেক্ষ, স্বাধীন, স্বতন্ত্র।

কাত্যায়নী। যতদূর বলিলে, পরিষ্কার বুঝিলাম; তোমাকে শত শত নমস্কার। কিন্তু আরো জিজ্ঞাস্য আছে।

মৈত্রেয়ী। আমাকে নমস্কার করিবার তোমার কোন অধিকার নাই। যিনি নমস্য তিনি সম্মুখেই।

কাত্যায়নী সহাস্যে মুনিবরের দিকে তাকাইলেন। মুনিবর বলিলেন,—"কোন সসীম বস্তুকে যদি নমস্য বুঝিয়া থাক, তবে বিজ্ঞান ও আত্মার প্রভেদ বুঝ নাই। তবে অসীম সসীমে প্রকাশিত, ইহা বুঝিলে এদিকে, ওদিকে (মৈত্রেয়ীর দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া) সকল দিকেই তাকাইতে পার।"

মৈত্রেয়ী। আমার মূল প্রশ্নের এখনও বিচার হয় নাই। একই পরমাত্মা যে সকলের আত্মা, ইহার প্রমাণ কি ? আজ ও কা'লকার আলোচনাতে এই প্রশ্নের উত্তর পূর্ব্বাপেক্ষা সহজ হইয়া আসিয়াছে বটে, কিন্তু এই বিষয়টী আরও স্পষ্টরূপে বুঝিতে চাই।

যাজ্ঞবল্ক্য। বুঝিবার পথে দাঁড়াইয়াছ, এখন কিঞ্চিৎ চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবে। বিষয়-বিষয়ীর ভেদের মধ্যে অভেদ ভাব বুঝিতে পারিতেছ কি না ?

মৈত্রেয়ী। এই বুঝিতে পারিতেছি যে বিষয়-বিষয়ী ভিন্ন হইলেও এক অবিচ্ছিন্ন সূত্রে সংযুক্ত; আর এই জ্ঞানময় সূত্রই পরমাত্মা।

যাজ্ঞবল্ক্য। বিষয় আমাদের জ্ঞানগোচর হইবার পূর্ব্বে ও পরে আমাদের আত্মা হইতে বাহির বলিয়া বোধ হয়। এই বোধ ঠিক কি না ?

মৈত্রেয়ী। এক অর্থে ঠিক, আর এক অর্থে ঠিক নয়।

কাত্যায়নী। কি অর্থে ঠিক ?

মৈত্রেয়ী। এই অর্থে ঠিক যে ইহা তখন বিজ্ঞানাত্মার জ্ঞানগোচর থাকে না।

কাত্যায়নী। কি অর্থে ঠিক নয় ?

মৈত্রেয়ী। এই অর্থে ঠিক নয় যে বিষয়মাত্রই পরমাত্মার নিত্যজ্ঞানে আশ্রিত।

যাজ্ঞবল্ক্য। তাহা হইলে পরমাত্মাতে অন্তর বাহির ভেদ নাই ?

মৈত্রেয়ী। না।

যাজ্ঞবল্ক্য। কর্ত্তা কর্ম্মের ভেদ নাই।

মৈত্রেয়ী। না, তা'ত ইতিপূর্ব্বেই বুঝিয়াছি।

যাজ্ঞবল্ক্য। তাহা হইলে তাঁহাতে 'এখান' 'সেখানের' ভেদ নাই ?

মৈত্রেয়ী। না, তিনি এই ভেদের অতীত, তাঁহাতে সর্ব্ব দেশ আশ্রিত।

যাজ্ঞবল্ক্য। তবে তাঁহাতে 'এখন' 'তখনের'ও ভেদ নাই ?

মৈত্রেয়ী। না তিনি নিত্য, সকল কাল তাঁহাতে আশ্রিত।